এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী

শিবরাম চক্রবর্তী

॥ কসমো স্ক্রিপ্ট ॥ ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

প্রকাশকাল : ১লা বৈশাখ ১৩৭০

প্রচ্ছদ : কুমার অজিত

প্রকাশিকা : তাপসী সেনগুপ্ত, ১১ নিতাই বাবু লেন, কলকাতা-৭০০০১২
মুদ্রক : শ্রোতা ঘোষ, এস. জি. প্রিন্টার্স, ১৪৪/১, রাজা
রামমোহন সরণি, কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতী শিউলি বসু

কল্যাণীয়াসু

এই লেখকের অন্যান্য বই :

হর্ষবর্ধণ আর গোবরধন
ইতুর থেকে ইত্যাদি
ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা
ভালবাসার অনেক নাম
শিব্রামের বারোয়াড়ী
ঘরনীর বিকল্প

এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী

বিগত বিশ্বমহাযুদ্ধের কাহিনী—

জাপানী বোমারু বিমানের আক্রমণে বর্মার আগাপাশতলা জুড়ে যখন একনাগাড়ে বোমাবর্ষণ চলছিল সেই কালের ঘটনা।

সারা বর্মা মুলুক জুড়ে ধারাবাহিক সেই বম্বকেসের মুখে, জলে জল বাধার মতন বোমায় বোমা টানে না? আমাদের নায়িকা এই মেয়ে ব্যোমকেশ সেই সময় গজিয়ে উঠেছিলেন। গজগজ করে উঠলেন হঠাৎ।

তারপর যা হবার। নায়িকার সোজাসুজি গজের কিস্তিতে বেচারা নায়ককে স্বভাবতই ঘোড়ার ভূমিকা নিয়ে আড়াই কদমের চাল দিয়ে দিগ্বিদিক খুঁজে বেড়াতে হয়—কিন্তু এই খোঁজাখুঁজির শেষ কি পায় কে?

মেয়ে মাত্রই ব্যোমকেশ। জন্মসূত্রেই এক একটি টিকটিকি। কেবল যে কথায় কথায় টিক টিক করে তাই নয়, যাকে সে গ্রাস করবে বলে সে তাক করে, সে বেচারা তার খপ্পর থেকে বাঁচতে নিরুদ্দেশ হয়ে যেখানেই পালাক না, তার নায়ককে ঠিক ঠিক খুঁজে বার করবেই।

তার হাত থেকে ত্রাণ নেই তার কিছুতেই।

আমাদের এই কাহিনীর তরুণী নায়িকা সত্যসন্ধানী বিখ্যাত ব্যোমকেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে পেরেছে কিনা তার বিচার পাঠকের।

তবে এটুকু হয়তো বলা যায়, পুরাকালের সাবিত্রী যেমন একদা সত্যবানের অনুসরণে যমালয়ের দরজা অবধি এগিয়েছিল, এই নায়িকাটিও তেমনি তার সত্যবানের পিছু ধাওয়া করে বর্মা থেকে দেড় হাজার মাইল পেরিয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছেছিল। এবং নিখুঁত ডিটেকটিভের মতই যথাকালে যথাস্থানে যথোচিত ভাবে তার আসামীকে যথাযথ পাকড়েছিল। এবং বলা বাহুল্য, তারপর আর সে ছাড়ান পায়নি।

সত্যি বলতে, মেয়ে মাত্রই এক একটি বোমা—শুধু যে শাশুড়ির সম্পর্কেই, তাই নয়। তাদের চোখে বোমা, কথাতেও মাঝে মাঝে তার বর্ষণ। আর মুখে—মুখে...? তার কথাই নেই। তার মুখেই বোমার সেই ব্রহ্মাস্ত্র—যা মুহূর্তের মধ্যে তোমায় আকাশে উড়িয়ে দিতে পারে। তার চুমায় এক লহমায় আমরা আত্মহারা হয়ে উড়ে যাই, হাতে হাতে স্বর্গ পাই আমরা।

বনমালীবাবুর বাড়ি বেড়াতে গেছি। ইডেন উদ্যানের তিনি হর্তা-কর্তা। উক্ত

উদ্যানের বৃক্ষলতা, ঝোপঝাড় এবং তাদের অন্তর্গত আদম-ইভ্দের (ইভনিং-এর দিকেই বেশীর ভাগ)—এক কথায় ওখানকার জল-স্থল-উদ্ভিদ-জঙ্গল ও জীবন—যাত্রার যাবতীয় প্রণালীর তিনি রক্ষক-বেক্ষক।

বাগানের এক টেরেই তাঁর টেরেস—কয়েকখানি কুঠরি নিয়ে ছোট্ট দোতলা। আশে পাশে সংলগ্ন এক টুকরো জমি—ফুলগাছ লতাপাতার কেয়ারি করা ছোট্ট আঙিনার মত—বাগানের মধ্যে বাগান এবং বাগানের মত করে বাগানো।

সব সময়েই কিছু ভূমাতে সুখ নেই, ভূমিতেও সুখ আছে বইকি। ভূমিসাৎ হবার বাসনাও রয়েছে আমাদের মনে অবিকল্প প্রবলরূপেই—যে বাসনা ভূমিকম্প হয়ে, নানাবিধ মদ্য হয়ে এবং যুদ্ধবিগ্রহ হয়ে দেখা দেয়। ভূমৈব সুখমেরই নানান রকমফের।

আবার বৃহৎ ভূমির চেয়ে ক্ষুদ্র ভূমিতে সুখ আরও। অত বড় ইডেন উদ্যানের সার্বভৌম হয়ে যত না সুখ, ছোট্ট এই নামমাত্র বাগানের তদারকি করে তার চেয়ে বেশী আনন্দ তাঁর। এই একানে জমিদারির একমাত্র ভূঁইয়া—বনমালী নিজে। মালীও তিনি, মালিকও তিনি।

গিয়ে দেখলাম—যেখানে আশা ছিল সেই বাগানে তাঁকে দেখলাম না—অন্যভূমিতে একেবারে ভিন্ন ভূমিকায়—রান্নাঘরে তিনি বিরাজ করছেন দেখা গেল। হাঁড়ি-কুঁড়ি হাতা-খুন্তি, শিল-নোড়া, চাটু-কড়া নানান ইত্যাকারের মাঝখানে মহাসমারোহে তিনি পর্যবসিত। তাদের চাটুকারিতায় বিপর্যস্ত।

কড়াইয়ের ভেতর জমজমাট কী একটা জিনিসকে ঘোরতরভাবে ঘাঁটছেন দেখা গেল।

ঘাঁটছেন কি ঘাঁটাচ্ছেন বলা কঠিন। যেমন আর্তনাদ তেমনি বিচ্ছিরি এক গন্ধ বেরিয়েছে কড়াই থেকে। নাকে কাপড় চেপে জিজ্ঞেস করি, 'একি, গাছপালার সখ্য ছেড়ে রান্নাবান্নার সখ কেন? ফুল ধরা হাতে, হাতা ধরেছ দেখছি?'

'আর বল কেন?' বলল বনমালী, 'বৌ বলেছে।'

বনমালীর এই কথায় ওর পত্নী-প্রাণতার আরেক কথা মনে পড়ে গেল। বেশিদিনের কথা নয়। একদিন এসে দেখি, বনমালী জামা টেঁকছে। বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, 'বিয়ে করেছ, বৌ রয়েছে ঘরে, নিজের জামা নিজেকে টেঁকতে হচ্ছে তোমায়? এ কী দশা?'

'আরে, আমার নয়, বৌয়ের জামা।'

কৈফিয়তের সুরে বলেছিল বনমালী। মনে কোন মালিন্য ছিল না ওর। মুখেও নয়।

সেদিন মনে মনে ওর পায়ের ধুলো নিয়েছিলাম। দাম্পত্য-মিলনের মাধুরি বজায় রাখতে ঐ টেঁক্সই বনমালীই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। এবং বনমালী সেদিন ব্লাউজ সেলাই করেই ক্ষান্ত হয়নি। নিজের উদাহরণকে আরও উজ্জ্বল করতে ফের আবার বৌয়ের রুমালে ছুঁচ ফুটিয়ে পাতা তুলতে

লেগেছিল।

কিন্তু রুমালের সেই পাতানো সম্পর্ক আর এমন কি! দিনদুপুরে এই রন্ধনলীলা—আনকোরা এক এনকোরিং ভূমিকা—সেই সূচিপত্রের পরে নতুন আরেক সূচনা।

জানা গেল আসন্ন বোমার আশঙ্কায় বনমালী তার বৌ-ছেলেকে দেশে পাঠাতে চেয়েছিল। বৌ কিন্তু কর্তার অভিভাবকত্ব ছেড়ে, বনমালীর বৃন্দাবন থেকে এক পা নড়তে রাজী নয়। সময়মত নেয়ে-খেয়ে বনমালী নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারবে কি না, সেই তার ভাবনা।

অন্ন-সমস্যাটাই বড়, অন্য সমস্যাগুলো তত নয়।

বনমালীকে তাই আজ রান্নার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। রাঁধতে পারলে তার পরে তো খেতে পারার সমস্যা। আর বৌকে দেশে পাঠানোর কথা তার আগে নয়। কোমর বেঁধে লেগেছে বনমালী।

'রিহার্সাল দিচ্ছি ভাই। রান্নার রিহার্সাল'—ওর গদগদ কণ্ঠ থেকে কান্নার মত হয়ে বেরিয়ে আসে।—'তরকারি রাঁধছি ভাই, বেগুনের চচ্চড়ি।'

'ও, তাই বুঝি ঘরকন্নায় লেগেছ? তা বেশ—বেশ তো। তা, শুধু গৌয়ের কাজ করতে পারলেই পাস, নাকি ঝিয়ের কাজও করতে হবে আবার?' আমি জিগ্যেস করি, 'গেরস্থালি করতে গেলে রান্নাই তো সবখানি নয়, থালা মাজার গেরোও আছে যে ফের।'

'কে জানে!...বাসন মাজতে তো বলেনি এখনো।' বনমালী কাতর হয়ে পড়ে। ওর আর্তনাদের সঙ্গে ওর কড়ার আওয়াজ পাল্লা দেয়।

'পালিয়ে এসো। আর ঘাঁটিয়ো না, বিচিচ্ছার গন্ধ বেরিয়েছে।...জল ঢেলে দাও উনুনে—নইলে ঘরদোরে আগুন লেগে যাবে বোধহয়। কী রকম ধোঁয়া ছেড়েছে দেখছ? ভালো ঠেকছে না বাপু, বুক কাঁপছে আমার।' বলি আমি। 'তোমার ওই বেগুন-চর্চা রাখো।'

বাবা, রান্নার কী ঘটা! এর অনুসরণে ভয়ঙ্কর আরও কিছু ঘটা বিচিত্র নয়। দমকল ডাকতে হতে পারে।

'বৌ ছেড়ে তুমি বাঁচবে না। আমরাও মারা পড়ব, শোন বনমালী।' কড়াইটা দপ্ করে উঠে আমার কথায় যেন সায় দেয়—তার ভেতরের জমজমাট জিনিসটা আরো জমকালো হয়ে ওঠে। মাঝখানের লৌহ-বেষ্টিত ব্যবধান সত্ত্বেও কি করে যে উনুনের আগুন আর কড়ার বেগুনের মধ্যে যোগাযোগ ঘটে, সমস্তটা অকস্মাৎ দেদীপ্যমান হয়ে দাঁড়ায়, সে-তত্ত্ব বড় বড় রাঁধিয়েরাই বলতে পারেন, কিন্তু সে রান্নায় জলাঞ্জলি দিতে আর দেরি করে না। দ্বিধা না করে এক বালতি জল সেই জাজ্বল্যমান সমূহের ওপরে ঢেলে দেয় তৎক্ষণাৎ।

আর আমি তার আগেই তাদের ড্রইংরুমে পালিয়ে আসি।

বনমালীও আমার পিছু পিছু এসে জড়ো হয়।

তার বৌ সেখানে জমা ছিলো—ছেলেপিলেরাও জমায়েত।

'কবে যে এই ছাইয়ের যুদ্ধ মিটবে।' হাতের জল আর কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বনমালীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

'আচ্ছা বাবা, কি করে যুদ্ধ বাধে, বল না?' ছোট্ট ছেলেটি জিগ্যেস করে বনমালীকে।

'কেমন করে যুদ্ধ বাধে? যুদ্ধের আবার বাধাবাধি আছে?' কথাটা এক কথায় উড়িয়ে দিতে চায় বনমালী, 'ও বাধলেই হল।'

'ও কি কথা?' বনমালীর বৌ ফোঁস করে উঠল, 'ছেলে জিগ্যেস করছে একটা কথা—তার ও কী জবাব?'

সত্যি কথা।

পারতপক্ষে অবোধ শিশুদের জ্ঞান-পিপাসা মেটানোই উচিত।

'এইরূপে ওদের তথ্যলালসা চরিতার্থ হতে হতে সেই অদম্য ক্ষুধাই ক্রমে ক্রমে এবং বেড়ে বেড়ে সামান্য পাঠশালা থেকে সিনেট হল মারফৎ অবশেষে কেরানীগিরির অফিসে গিয়ে ওদের দাঁড় করাবে—কৌতূহলের যেখানে চরম পরিণতি।' বৌয়ের কথায় আমি সায় দিই।

'আচ্ছা আচ্ছা।' বনমালী আরম্ভ করে, 'এই মনে করো ইংরেজরা ফরাসীদের সঙ্গে ঝগড়া বাধালো।'

'কিন্তু'—বনমালীর বৌ বাধা দেয়, 'ফরাসীর সঙ্গে ইংরেজের ঝগড়া বাধবে কেন? তাই কি বেধেছে?'

'বাধেনি জানি।' বনমালী বলে, 'আমি কথার কথা বলছিলাম।'

'এইভাবে ছেলেপিলেদের তুমি ভুল শিক্ষা দিচ্ছ।'

'না কিছুতেই না, ভুল শিক্ষা দেব কেন?' বনমালী রুখে দাঁড়ায়—পদদলিত পতঙ্গও কি এক এক সময়ে বিগড়োয় না?

বিশেষত, সেই পতঙ্গকে একটু আগে যদি অগ্নিকাণ্ডের আকর্ষণ এড়িয়ে প্রাণ হাতে করে পালিয়ে আসতে হয়ে থাকে।

'হ্যাঁ দিচ্ছ।'

'না দিচ্ছিনে।'

দুপক্ষই একরোখা। দোরোখা। দাম্পত্য কলহ।

'হয়েছে বাবা,' বড়ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলল, 'যুদ্ধ কি করে বাধে, আমরা বুঝতে পেরেছি এখন।'

এই গৃহযুদ্ধের মাঝখানে টেলিফোনের ঘণ্টা ঝনঝনিয়ে উঠল আবার। রিসিভারে কর্ণপাত করে বনমালী চেঁচাতে থাকে।

শোন ফের! এদিকে আবার আরেক ফাসাদ। কতদিক যে সামলাই!' আমি শুনতে লাগলাম। দুদিকের কথাই শোনা গেল। স্পষ্টই। লেখকদের শুধু যে দিব্যদৃষ্টি থাকে তাই না, দিব্যকর্ণও মস্ত সহায়।

কেবল চেহারাটা দিব্য হয় না এই যা, তাহলে ত্রিদিবের সব দ্রব্যই তাদের করতলামকলবৎ হয়ে যেত। সেটা খুব ভালো হত কি না দিব্যি গেলে বলা কঠিন।

ইডেন গার্ডেনের বনেদী মালী বনমালীকে হাঁক পেড়েছে—বাগানের এক বিশেষ অঞ্চলে এক নির্বিশেষ ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। লোকটাকে দেখলে বিদেশী বলেই মনে হয়। ঝোপঝাড়গুলোর ঘাড় ছাঁটছিল এমন সময় তার নজরে পড়েছে।

বনমালী।—কারো পকেট কাটবার মতলবে ঘুরছে না তো?

বনেদী মালী।—কাছাকাছি কারো পকেট নেই।

বনমালী।—পকেটগুলো গেল কোথায়?

বনেদী মালী।—বাগানের ওধারটায় এমনিতেই কেউ যায় না। হাওয়া খাবার যারা তারা তো প্যাগোডার দিকটায় বেড়াচ্ছে।

বনমালী।—পকেটকাটা নয় তাহলে? কি বল?

বনেদী মালী।—আজ্ঞে, কাঁচি তো আমার হাতে।

বনমালী—তুমি? তুমি কাঁচি নিয়ে কি করছ? উপরি উপায়ের চেষ্টায় বেরিয়ে থাকলে কথাটা আমায় জানিয়ে ভালো করনি। মনে রেখো আমি তোমার উপরওয়ালা।

আমি (বাধা দিয়ে বলি)।—কেন তোমাকে বখরা দিতে হবে নাকি তাহলে?

বনেদী মালী।—আজ্ঞে, পকেট কাটা কাঁচি নয়, পেল্লায় কাঁচি। ঝোপঝাড়-গুলোর ঘাড় ছাঁটাই করছি বললাম না?

বনমালী।—ও, সেই কাঁচি! সেই রাম কাঁচি! কাজ করছ? করো করো। লোকটা কিভাবে ঘোরাফেরা করছে বললে?

বনেদী মালী।—সন্দেহজনকভাবে। পা টিপে টিপে। পা টিপে টিপে বললে বোধহয় অত্যুক্তি করা হয়--ঠিক তা নয়--হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটছে বললেই ঠিক হবে।

বনমালী।—হামাগুড়ি দিচ্ছে—প্রজাপতি ধরবার ফিকিরে নেই তো? কোন দুষ্টু প্রজাপতিকে ধরবার মতলবে নয় তো?

বনেদী মালী।—আজ্ঞে আমার মনে হয় শত্রুপক্ষের কোন চর।

বনমালী।—তুমি হাসালে বিপিন! আমাদের আবার শত্রুপক্ষ কে? আমরা কার খাই না পরি? আমাদের পেছনে আবার কে চর লাগাবে?

'চড় লাগাতে বলো।' আমি বললাম।

বনমালী বলল, 'অ্যাঁ?'

'এক চড় মেরে ভাগিয়ে দিতে বলো না।' আমি বাৎলাই।

'লোকটা ঝোপের আড়াল দিয়ে হাঁটু টিপে টিপে হাঁটছে। এখনও হাঁটছে। কোনদিকে তাকাচ্ছে না। জাপানের গুপ্তচর বলেই আমার সন্দেহ হয়। ঐ যে—খবরের কাগজে যাদের পঞ্চম-বাহিনী বলেছে—তারাই হয়তো।' বিপিন জানায়।

বনমালী।—কী সর্বনাশ! আমার আড়তে পঞ্চম বাহিনী। কোথায় যাব আমি। অ্যাঁ, লোকটা দেখতে কিরকম?

বিপিন।—একদম বিদেশী। আধা বর্মী, আধা বাঙালী, আধা চীনেম্যান্.

অর্ধেক উড়ে, আধখানা মাদ্রাজী।

বনমালী।—হুম। পঞ্চম-বাহিনী নির্ঘাত। লোকটার ওপর লক্ষ্য রাখো। কী করে, ঐভাবে হামাগুড়ি দিতে দিতে কোথায় যায়, কদ্দুর গড়ায়, ওৎ পেতে দ্যাখো। ইতরবিশেষ কিছু দেখলেই তৎক্ষণাৎ আমায় জানাবে। হঠাৎ লক্ষ্যভেদ কোর না, বুঝেছ? ও যেন কিছু টের না পায়।

বিপিন।—যে আজ্ঞে।

বনমালী ভাবনায় পড়ল। ভাবনার কথাই বই কি। ব্যাপারটা আগাপাশতলা ভেবে দেখলে কেবল ব্যস্ত নয়, ব্যতিব্যস্তই হতে হয়। শুধু কালমাহাত্ম্য না, ইডেন গার্ডেনের স্থান-মাহাত্ম্যও দেখতে হবে। দক্ষিণে সরকারী কেল্লা সাক্ষাৎ ফোর্ট উইলিয়ম, আর উত্তরে বাঙালদের দ্রষ্টব্য খোদ হাইকোর্ট, পশ্চিমে সর্বদা তটস্থ পোর্ট কমিশনারের ভাগীরথী, আর পূর্বে Sir-গর্ভ লাট-সাহেবের প্রাসাদ—এহেন ভৌগলিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে বনমালী সরকারের ইডেন গার্ডেনের পারিস্থিতিটা, এই অপ্রত্যাশিত উপস্থিতির দ্বারা সমস্ত জড়িয়ে কতখানি ক্ষতির সম্ভাবক ক্ষতিয়ে দেখলে দুর্ভাবিত না হবার যো কি।

এই অঞ্চলে, এরূপ উদ্যানাঞ্চলে, যদি হামাগুড়িপরায়ণ পঞ্চম-বাহিনীরা ওতোপ্রোত হতে থাকে তাহলে স্বভাবতই একটু বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। বিচলিত না হয়ে উপায় নেই।

বনমালীর বড়ছেলে বলল, 'বাবা আমরা তোমার বাগানে গিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলব?'

বনমালীর কপালে আরেকটা রেখা পড়ল।

'খেলগে, কিন্তু এয়াররেড শেলটার বাঁচিয়ে, তোমাদের খেলার চোটে কোম্পানীর বম্ব্-প্রুফ শেলটারের কোন হানি না হয়, সেদিকে যেন খেয়াল থাকে।'

'যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলব তো। আমরা কি আর ক্রিকেট খেলছি যে বল গিয়ে লাগবে তোমার শেলটারের গায়ে?'

ছেলেরা চলে গেলে আমি বললাম, 'সেকালেও পঞ্চম-বাহিনী ছিল—পঞ্চশরের পঞ্চম-বাহিনী। আজকের বনমালীদের মত সেদিনের বনচারীদের তারা ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতো—কিন্তু এর চেয়ে আরো কত মুখরোচক ছিল ভাবুন তো! কি বলেন বৌদি?'

গুরুতর মেঘলাটাকে পিঁজে হালকা করার আমি পক্ষপাতী।

বৌদি বলেন, 'সব সময় তোমার রসিকতা আমার ভালো লাগে না।'

'বাস্তবিক, এই কি রসিকতার সময়? একটু আগে একটা বিপর্যয় গেছে—ঘোরতর বিপর্যয়—তার ওপরে আরেকটা হাঙ্গাম মাথার ওপর আসন্ন—এই সময়ে তোমার রসিকতা?' বনমালীও তেতে ওঠে।

ছেলেদের কলোচ্ছ্বাস আর ছোট ছোট পায়ের শব্দ ভেসে আসে ছোট্ট বাগান থেকে। আকৃষ্ট হয়ে আমি আর বনমালী জানালায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

'সুখেই আছে ওরা।' বনমালীর কপালের কুটিল রেখাগুলি সরল হয়ে আসে। 'শিশুর মনে কোন ভাবনা নেই।' বললাম আমি।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে, বিগত শৈশবের কথা ভেবে বোধহয় আমাদের হাসি পায়। দেখি ছেলেদের লীলাখেলা।

বড়ছেলেটি বলছিল, 'আমি আর-এ-এফ-ইংরেজের বোমারু প্লেন, বুঝেছিস? আর তুই হচ্ছিস জার্মানীর ট্যাঙ্কের কারখানা—কেমন তো?'

'না। তা কেন হতে যাব?' ছোট আপত্তি করে।

'খুব-খুউব-খুউউব বড় ট্যাঙ্কের কারখানা—তুই হবিনে?'

এবার ছোটকে টলতে হয়। বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে। ছোট তো সে হয়েই আছে—বড় হবার এ সুযোগ সে ছাড়তে পারে না।

'হ্যাঁ তাহলে হতে পারি।' সে রাজী হয়। যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা শুরু হয়ে যায়। এ রাম-রাবণের যুদ্ধ নয়—মোড়ার গর্ভজাত তীর এবং ব্যাঁকারির ধনুকের সাহায্যে ছোটবেলায় আমরা যা খেলেছি—যুদ্ধের মোড় ফিরেছে—এখন আলাদা সমর-কৌশল। ছোটছেলেটি বাগানের এক কোণে গিয়ে দাঁড়ায়। আর বড়, দুই হাত, ঠিক পাখার মত নয় চাকার মত করে ঘোরাতে ঘোরাতে ভরর্‌র্‌ ভরর্‌র্‌ আওয়াজ ছেড়ে ট্যাঙ্কের কারখানার দিকে এগুতে থাকে। তির্যক বেগে এঁকে বেঁকে এগোয়। কাছাকাছি গিয়ে পকেট থেকে একখানা পাটকেল—আধখানা ইটও বলা চলে—বার করে কারখানার দিকে তাক্ করে লাগায়।

কারখানার কাণ্ড দেখি এবার। চক্ষের পলকে সে মাথা খেলিয়ে বোমার হাত থেকে আত্মরক্ষা করেছে। মাথা দুমড়ে, সমস্ত দেহকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে কোমরের পরিশিষ্ট কারখানার বহির্ভাগকে আক্রমণকারীর দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজের ভাগ্য সামলেছে।

বিলিতি বোমারু ফিরে গেছে আকাশে। 'বুম বুম—বুম বুম বুম। কেমন করে আমি ডাইভ বম্ করি দ্যাখ এবার।' ঘুরতে ঘুরতে পাক্ খেতে খেতে এরোপ্লেনটা কারখানার পশ্চাৎভাগে এসে এক গোঁত্তা লাগিয়ে দিয়েছে এবার।

'উঃ—জোচ্চোর!' চেঁচিয়ে উঠল কারখানা—ঘুষি উঁচিয়ে।

'আমাদের সমস্ত বিমান নিরাপদে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরেছে।' সুদূরে গিয়ে ঘোষণা করল আর-এ-এফ।

'কোথ্থেকে যে এসব শেখে।' বলল বনমালী।

'খবরের কাগজ, কোথায় আবার।' আমি বলি।

ধ্বংসপ্রাপ্ত কারখানা কিন্তু ছেড়ে কথা বলার পাত্র না। এক চাপড়া মাটি তুলে বীরদর্পে সে এগিয়েছে—আর-এ-এফ-এর এসপার ওসপার করে তবে ছাড়বে।

'আরে আবে করছিস কি! ট্যাঙ্কের কারখানা বিলেতে এসে আক্রমণ করবে—তা হয় নাকি? মাঝে সমুদ্র নেই?' বড়ছেলে ঘোরতর আপত্তি জানায়। 'কারখানার কি পাখা আছে যে উড়বে?'

'তবে এসো, অন্য রকম যুদ্ধ খেলি।' যুদ্ধের পৈশাচিক নৃশংসতা খেলা যাক।'

'পৈশাচিক নৃশংসতার মানে হচ্ছে ইনকম্ ট্যাক্সো। বাবা বলেছে।'

'কী সর্বনাশ!' বনমালী বলে, আর বনমালীনির দিকে তাকায়। সভয়ে।

'এখনই কী হয়েছে!' আমি বলি, 'এই তো সবে যুদ্ধের শুরু।'

'না, অত শক্ত খেলায় কাজ নেই।' বড়ছেলে বলে, 'তার চেয়ে আমরা সন্ধি করি, সেই ভালো।'

'সে কি করে হয়?'

শত্রুপক্ষ জানতে উৎসুক।

'প্রথমে, আমি তোমার পেছন থেকে ছুরি মারব।' বড়ছেলে জানায় অত্যন্ত সহজভাবে।

'কেন?'

'তা জানিনে।' বড়ছেলে বলে, 'তবে তাই নিয়ম। তা না হলে সন্ধি হয় না।'

'আমি তোমার পেছনে ছুরি মারব, তারপর আমাদের যুদ্ধ মিটে যাবে, অস্ত্র সমর্পণ করব আমরা, আর আমাদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা সম্মিলিত হব তখন।'

'বেশ।' ছোটছেলে সম্মত হল। 'ছুরি মারো, তবে খুব জোরে নয় কিন্তু।'

ছুরিকাঘাত পর্ব সমাপ্ত হবার পরেই হল সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা। উভয়পক্ষ মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। যথাশাস্ত্র—যেমন দস্তুর। 'আমি সন্ধি চাই!' বলল বড়ছেলে—দু হাত তুলে। ছোটছেলেও তার পুনরুক্তি করল হাতে ও কলমে। 'বেশ, তোমার যা কিছু আছে সমস্ত আমায় দিতে হবে। তাহলেই আর তোমার সঙ্গে আমার কোন যুদ্ধ নেই।' বলল বড়।

'তাই হবে। কিন্তু এরপরে আমরা করব কি?' ছোটর জিজ্ঞাস্য।

'কেন?'

এরপর আমরা ফুর্তি করব আর গির্জার যত ঘন্টা আছে সব বাজতে থাকবে।'

আর তার পরমুহূর্তে তারা ফুর্তি করতে শুরু করল—পাগলের মত ছুটোছুটি করে। আর ঢং ঢং ঢং ঢং অবিশ্রান্ত আওয়াজ বেরোতে লাগল তাদের ভিতর থেকে।

'মাটি করল! মাটি করল!! সমস্ত ফুলের কেয়ারী আমার মাটি করে দিল!!!' বনমালী হায় হায় করে।

'যুদ্ধে অমন অনেক মাটি হয়।' আমি সান্ত্বনা দিই, 'আবার ঐ মাটি থেকেই নতুন ফুলের কেয়ারি গজায়।...যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে।'

ওদের ঢং দেখছি, এধারে ফের টেলিফোনের ঢনৎকার। বিপিন খবরদারি করছে। বিপিন।—লোকটা ঐভাবে হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে—এখনো এগুচ্ছে।

বনমালী।—এখনো হামাগ্নড়ি দিচ্ছে—কী ভয়ানক? কোন্‌দিকে এগ্নচ্ছে?

বিপিন।—লাটসাহেবের বাড়ির ওপর ওর নজর। সেই দিকেই এগ্নচ্ছে মনে হয়।

'অ্যাঁ বলো কী?' বলে বনমালী। ওর বেশী আর বলতে পারে না, ভাবাবেগে ওর কণ্ঠ র্নদ্ধ হয়ে আসে। লোকটা ওই দিকেই এগ্নবে যেন ওর জানা ছিল—অবচেতনায় ভাবনাটা ঘ্নরপাক খাচ্ছিল মনে হয়। এখন ষড়গ্নণবলিজারিত মকরধ্বজ হয়ে দেখা দিল।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। লোকটা চৌকিয়োর রাস্তা ধরেছে বলেই ধরা উচিত। যে হারে এগ্নচ্ছে,' বিপিন জানায়, 'তাতে আন্দাজ, মাসখানেকের মধ্যে লাট-সাহেবের দরজায় গিয়ে পেঁছবে। তারপরে চৌকিয়ো পেঁছতে—তা যাই লাগ্নক—ওর হালচাল আমাদের সামরিক গতিবিধির সঙ্গে ঠিকমতই খাপ খায়। তাতেই আমার সন্দেহ আরও।'

'আর এক মিনিট দেরি না করে, এক্ষ্নণি তুমি পার্ক স্ট্রীট থানায় দৌড় দাও—ট্যাক্সি ট্রাম বাস যা পাও সামনে, ব্নঝেছ? খবর দাও গে থানায়।'

বিপিনকে উধাও করে দিয়ে বনমালী বললে, 'আমিও লালবাজারে একটা ফোন করে দিই, কি বল? বড় দপ্তরে খবরটা যাক। সাবধানের বিনাশ নেই।'

হামাগ্নড়িদাতাকে পঞ্চম-বাহিনীর লোক বলে. প্নলিসের কাছে পরিচিত করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না বনমালীর। এক দ্নগ্ধপোষ্য ছাড়া আর কারো হামাগ্নড়ি বরদাস্ত করতে প্ৃথিবী প্রস্তুত নয়—প্নলিস তো আরও কম।

ইডেন গার্ডেনের মত জায়গায়—এই অসময়ে—এমন হামাগ্নড়ি—এর বেশী আর বলতে হল না। সত্যি বলতে, হামাগ্নড়ি দেয়ার পক্ষে (আপনার আমার কথাই বলছি) সব সময়ই অসময় আর সর্বত্রই অস্থান—এত বড় প্ৃথিবী একান্ত অপ্রশস্ত। আর সব কিছ্ন আমরা দিতে পারি, যথাসর্বস্বই, কিন্তু একটা জিনিস—ঐ হামাগ্নড়ি—সাধ হলেও দেবার আমাদের সাধ্য নেই। দাতাকর্ণকেও দিতে হলে তিন পা পেছোতে হবে।

'চলো. প্নলিস কি করে দেখা যাক এবার', বনমালী বেরিয়ে পড়ল আমাকে নিয়ে। তার ছোট্ট কুঞ্জবন ভেদ করে চলেছি, কোত্থেকে একতাল কাদা এসে লাগল আমাদের গায়ে। সেই তাল সামলাতে না সামলাতে আরেক তাল এসে কাপড়-জামা কলঙ্কিত করে দিল। যোদ্ধ্নব্নন্দের লক্ষীভ্নত হয়েছি বোধহয়।

'ইস্‌! দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি', বনমালী ক্ষেপে ওঠে।

'আর মজা দেখায় না। য্নদ্ধের মজাই এই।...ওরা সাধারণ শত্রুর বির্নদ্ধে সম্মিলিত হয়ে অস্ত্রধারণ করবে বলছিল না?'

আমার স্নক্ষ্মদ্নষ্টি খ্নলে যায় হঠাৎ, আমাদেরকেই সেই শত্রু ঠাউরেছে কি না জানে। ছোট বাগান থেকে বড় বাগানে এসে পড়েছি। প্যাগোডার ধার ঘেঁষে চলেছিলাম—একজোড়া সাহেব-মেমের পাশ কাটিয়ে।

সাহেবটা বলছিল, 'I Will give you a fur collar, if you let me kiss you,

a fur cap if you let me hold tight, a fur coat if you...... ?

'Stop ! That's fur enough.' শোনা গেল মেম্‌টির ঝাঁঝালো গলায়।—'No further.'

আমরা পেঁছিবার আগেই লালবাজার থেকে লরি বোঝাই কনস্টেবল আর সার্জেন্ট এসে পেঁছে গেছে। মায় খোদ্ পুলিস সাহেব পর্যন্ত। লড়ালড়ি শুরুর বিশেষ দেরি নেই।

পুলিস সাহেব বললেন, 'তোমরা চারধার ঘিরে থাকো, যেন পালাতে না পারে। আমি একাই ভেতরে যাব।'

সার্জেন্ট-কনস্টেবলে ঘেরাও করে ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল,—তিনি একাই রিভলবার হাতে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে অকুস্থলে প্রবেশ করলেন।

লোকটা তখনও তদ্‌গত ভাবে তদবস্থায় ছিল, দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও, বনমালী আর আমার নজর এড়ায়নি। ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে খানিকক্ষণ না হাতড়াতেই হামাদাভাটি সাহেবের হাতে এসে আটকে গেল। এক হাতে লোকটাকে হাতিয়ে, কলকাতার প্রথম পঞ্চম-বাহিনীকে হস্তগত করে, আরেক হাতে গোঁফে তা দিতে দিতে (রিভলবার তখন পকেটস্থ) পুলিস সাহেব সগর্বে গার্ডেনের বাইরে এসে উপস্থিত হলেন। লোকটার হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দিতে দেরি হল না বিশেষ। সব কিছুর হেস্তনেস্ত করে সাহেব তাঁর মোটরে গিয়ে উঠলেন।

লালবাজারি পল্টন তাদের শিকার নিয়ে চলে গেলে পার্ক স্ট্রীটের পুলিস ফৌজ এসে হাজির হল তারপর। তাদেরও ইনস্পেক্টর, সার্জেন্ট, কনস্টেবলের কিছু কমতি ছিল না। লালপাগড়ির জলুসই বা কম কি!

লাল পল্টন নিয়ে সারা বাগানের সমস্ত কিছু ইনস্পেক্টর সাহেব নিজে তন্ন তন্ন করলেন। আর এই রকমের চুলচেরা খোঁজাখুঁজির ফাঁকে, কাঁটাঝোপের আড়ালে লুক্কায়িত আরেকজন ধরা পড়ল এবার। ইনস্পেক্টর সাহেব, নিখুঁতভাবে ইনস্পেক্‌সন করে নিজেই তাকে পাকড়াও করলেন।

আর এইভাবে একমাত্র স্থলে একই দিনে কলকাতার দ্বিতীয় পঞ্চম-বাহিনী ধরা পড়ল।

এবার একটি মেয়ে।

এতবড় ট্রাজেডির পর বনমালীকে পরিত্যাগ করে আমি কার্জন পার্কে এসে বসলাম। 'মা নিষাদে'র পরে এরকম বিষাদের ব্যাপার ইহলোকে খুব বেশী ঘটেছে বলে মনে হয় না। যাই হোক, এরূপ বিরাট আড়ম্বরের পরে কিছু লঘুক্রিয়া দরকার—চীনাবাদাম খেলে খুব মন্দ হত কি? পয়সার জন্য পকেট হাতড়াতে গিয়ে একটা পোস্টকার্ড পাওয়া গেল—নাকের বদলে নরুণ।

একটা আলোচনা-সভার আমন্ত্রণ-পত্র। 'যুদ্ধকালীন সাহিত্যের রূপ কী হতে পারে'—এই ছিল আলোচ্য বিষয়। আর আজ বিকেলেই ছিল সেই দুর্যোগটা।

যুদ্ধকালীন সাহিত্যের রূপ কী হতে পারে? বাস্তবিক এটা একটা ভাবনার বিষয় বটে। যখন আমরা ভালবাসি তখন আমরা ভালবাসার কোন রূপ দিতে

পারি না। ভাবতেই পারি না সে সম্বন্ধে। দেখতে পেলেও দেখাতে পারি না বোধহয়। তার ঢের পরে, সেই ভালোবাসা জীর্ণ হয়ে গেল, হয়তো জরাজীর্ণ হয়ে গেলে, তখনই পূর্ব অনুভূতি রসোত্তীর্ণ হয়ে আমাদের রূপায়ণে অপূর্বতা লাভ করে। মানে, করলেও করতে পারে। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, এর মানসিক প্রতিক্রিয়া সাহিত্যে রূপান্তর করতে গেলে তার বেলায় কি সেই রীতির কোন ব্যত্যয় ঘটবে?

যুদ্ধ তো বলতে গেলে ভালোবাসারই বিকৃতি—আশ্চর্য বিরূপান্তর। একজনকে আত্মসাৎ করবার যে লালসাকে আমরা প্রেম বলি, তা-ই অনেকজনের প্রতি প্রকারান্তরে প্রযুক্ত হলে যুদ্ধ হয়। অবশ্য, যুদ্ধের সময়ে ঐকান্তিক প্রেমের গল্প লেখা সম্ভব কিংবা সহজ না হতে পারে, কিন্তু যুদ্ধের গল্প লিখলেই যে তা সার্থক হবে—এবং তা লেখাই সর্বতো প্রয়োজন তার কী মানে আছে?

তবে সাহিত্যের রূপ যাই হোক, যুদ্ধকালীন সাহিত্যিকের একটা রূপ আছে নিশ্চয়ই। আমাদের দেশে অন্তত আছে। নানা দল ও দলাদলিতে বিভক্ত সদ্যোজাত যুদ্ধকালীন রাজনীতিজীবীদের মতই তা বুঝি অপরূপ। কম্যুনিস্ট রূপ, নিয়মনিষ্ঠ রূপ, ফ্যাসীবিরোধী রূপ, গণতান্ত্রিক রূপ—তথাকথিত এ'রা গোত্র আর নামে আলাদা হলেও আসলে কিন্তু পরস্পরের অনুরূপ। কূট-নীতিকের দাদার-জয়-গাওয়া প্রচারক রূপ, অর্থনীতিকের লোকের চোখে ধাঁধা দেওয়া প্রতারক রূপ প্রভৃতি কর্তাভজা বহুরূপের সঙ্গে বহুরূপী লেখকের যা ফারাক্ তা কেবল তালে আর মানে। তবু এসব রূপের মধ্যে চাকচিক্য আছে—রূপার চাকচিক্য। আর এ'দের বাইরে যারা—হতভাগ্য আমরাই—তাদের বরাতে কাগজ নেই, প্রকাশক নেই, নিজের বই নিজের ছাপানোর উপায় নেই, (আর ছাপাবার টাকাই বা কোথায়?) এধারে লেখার মজুরী নামমাত্র—আমাদের একান্তই অপদার্থ রূপ। অবশ্য, খাঁটি সাহিত্যের পক্ষে সামরিক রসায়ন লাভের সম্ভাবনা এসময়ে না থাকলেও, খাঁটি সাহিত্যিকের পক্ষে সামরিক রূপ নেবার কোনও বাধা ছিল না বোধহয়।

দেশে জাতীয় গভর্নমেণ্ট স্থাপিত থাকলে অন্তরের স্বাভাবিক প্রেরণায় অতি সহজেই সেই রূপান্তর আমরা লাভ করতাম। এবং তাহলেই বুদ্ধি আর হৃদয়ের এই বিরোধ আর বঞ্চনা থেকে—এ যুগের বুদ্ধিজীবীদের যে ট্র্যাজেডির কথা নোগুচি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন—তারই বিকারান্তর থেকে আমাদের নিস্তার ছিল। দেশ স্বাধীন হলে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কলম ছেড়ে আর সকলের সঙ্গে অস্ত্র ধরাই লেখকদের উচিত ছিল নাকি? অস্ত্রকেই লেখনী করে নিজের শত্রুর সম্মিলিত রক্তাক্ষরে জীবনের পৃষ্ঠায় আরেক সাহিত্য-রচনার দায় ছিল নাকি তখন? তেমন হলে, আমার এই বীরবপু নিয়ে এমন কি আমিও হয়তো বিজাতীয় অভিযানের বিরুদ্ধে রুখে এগুবার পথ দেখতাম—পেছনের পথ পরিষ্কার না রেখেই। কিন্তু যে কারণেই হোক, তা যখন হয় নি, তখন অগত্যা আমাদের—আমাদেরও এই আত্মবঞ্চক বিজ্ঞরূপ—আর আমাদের রচনার এই নিতান্ত বিজ্ঞাপন-রূপ।

সাহিত্য-সভায় গিয়ে এই নব-রূপকথা ব্যক্ত করব কিনা ভাবি একবার। মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম! তা ছাড়া আই মাস্ট নট হেল্প স্টর্ম ব্রুইং! ফাঁসি-বিরোধীরা নিজেদের কাছ গুছোচেছ, আমাকে তো ফাঁসি দিচেছ না—এখনও নয়। তবে কেন? চাই কি, কোন কোন দুঃসময়ে, ভগবান না করুন, তাদের কারো কাছে হয়তো দু'চার টাকা ধার পাওয়া যেতে পারে। লাভ কি চটিয়ে?

এবং কাদালাঞ্ছিত নিজের রূপটাও তো দেখাতে হয় একবার। যুদ্ধকালে সাহিত্যিকের এই চেহারা সুহৃদ্‌দের দেখিয়ে কি সুখ?

অতএব চটেমটে একটা সিনেমায় চলে গেলাম এবং যুদ্ধকালীন চলচ্চিত্রের রূপ দেখে (প্রায় অবিকল রূপ!) বিরূপ হয়ে বাড়ি ফিরলাম সন্ধ্যায়।

ঘরে ঢুকতেই আশা করা গেছল চায়ের গন্ধ পাব। টোস্ট অমলেট বিস্কুট সাজিয়ে কল্পনা বসে আছে, দেখছিলাম কল্পনানেত্রে। কিন্তু না, চায়ের গন্ধ তো নেই-ই, কল্পনাও নিশ্চিহ্ন।

চায়ের আশা যখন লোপ, আরাম করে শুয়ে পড়া যাক গিয়ে। কি আর করা যাবে? শয়ন-কক্ষের দরজা ঠেলে প্রবেশ করি।

'নমস্কার বাবা!' দ্বারমুক্তির সাথে সাথে মুক্তকণ্ঠের আহ্বান এল। উচ্ছ্বসিত ললিত অভ্যর্থনা।

ধাক্কা খেলাম, একথা অস্বীকার করব না।

প্রায় হার্টফেল করতে গিয়ে বেঁচে গেলাম বলতে চাই।

'বাবা' কথাটা আমার অপরিচিত নয়, একান্ত অশ্রুতপূর্ব যে তাও বলি না, তবে শব্দটা যতই সুমিষ্ট হোক আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত হতে শুনি নি কখনো, ভাইফোঁটার দিনে পাত্তা না পেলেও দাদা হতে বাধে না, বিয়ে না করেও স্বামীত্বের কল্পনা করতে পারি, বিন্দু-বিসর্গ না জেনেও আসামী হওয়া যায়, এমন কি, না-বিইয়েও কানায়ের মা হতে শুনেছি, কিন্তু অপুত্রক আমার পিতৃ-সম্বোধন-লাভের অভিজ্ঞতার কাছে সে-সব বোধহয় কিছু নয়।

এত বেশী বিচলিত হয়েছিলাম যে, আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। আমার ভ্রাতৃতুল্য সেই পুত্রের দিকে নিষ্পলক হয়ে রইলাম অনেকক্ষণ।

বিপিনের ভাষায় বলতে গেলে, আধা বর্মী, আধা বাঙালী, অর্ধ চীনেম্যান্, অর্ধেক উড়ে, আধখানা মাদ্রাজী। তার ওপরে তিন ভাগ ফিলিপাইন্ আর এক ভাগ নিউগিনি যোগ করলে হয়তো পুরোপুরি হয়। কিন্তু এই মোগলাই চীজ্ এখানে আমার ইজিচেয়ারে কেন?

আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট দেখে ছেলেটি বলল, 'ও' আপনি বুঝি জানেন না? মা আমাকে পোষ্যপুত্র নিয়েছেন। আমার কাপড়জামা কিনতেই বেরিয়েছেন তিনি এখন!'

'কৃতার্থ করেছেন।' বললাম মনে মনেই। 'কিন্তু, তুমি কে?' মুখ ফুটে বেরুল আমার।

'আমি একজন বার্মা-ইভ্যাকুয়ী।'

'বার্মা-ইভ্যাকুয়ী'—

আকাশ থেকে পড়তে হল। এখানে কেন—এ প্রশ্ন কোনও ইভ্যাকুয়ীকে করা যায় না। কোনও বর্মা-ইভ্যাকুয়ীকে তো নয়ই। সর্বত্র তাদের অবাধগতি। তবে এখন কেন, এ জিজ্ঞাসা করা চলে হয়তো বা।

'য়্যাদ্দিন বাদে বর্মা-ইভ্যাকুয়ী—তা কি করে হয়?'

'তাই হয়েছে বিশ্বাস করুন। ইংরেজের আমলে জাপানীদের বোমার সময়ে তবু কোনও রকমে টেকেছিলাম, কিন্তু জাপানীদের আমলে আপনাদের বোমার জ্বালায় এখন আর সেখানে টেকা যাচ্ছে না। দগ্ধে দগ্ধে মরি কেন, তাই চলে এলাম।'

'বটে বটে? এরা গিয়ে খুব বোমাচ্ছে বুঝি?' শুনে আমার অদ্ভুত পুলক হল।

'আর বলবেন না।' ছেলেটি বলে। 'যৎপরোনাস্তি।'

ছেলেটিকে বেশ নিখুঁত বলতে হবে। নিরীহ গোছের জীব। ভদ্রভাবে লালিত-পালিত এবং সযত্নবর্ধিত বলেই সন্দেহ হয়। বসবার-উদ্দেশ্যে আমি চারধারে তাকাচ্ছি দেখে তৎক্ষণাৎ সে আমার ইজিচেয়ারটা ছেড়ে দিল। নিজে গিয়ে বিছানার এক কোণে বসল।

'তোমার নাম কি বাপু?'

'বাপু বলবেন না, আপনি আমাকে বৎস বলে ডাকবেন?'

'আচ্ছা তাই হবে। এখন নাম বলত।'

'আজ্ঞে, বিক্রম সিং প্রধান।'

'তোমরা কি? বাঙালী—না অন্য কিছু?'

'আমার বাবা ছিলেন রাজপুত ছত্রপতি সিং আর মা উড়ে—রত্নপ্রভা প্রধান—তবে আমি—বাঙালী—বাংলা ইস্কুলে পড়তাম কিনা—বাঙালীদের সঙ্গেই মিশতাম বেশি। তবে বর্মীও বলতে পারেন আমাদের।' বলল বিক্রম সিং। 'আপনার যা ইচ্ছে।'

ব্রহ্মদেশে বাঙালীর বিক্রমের কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তার তাড়সে রাজপুতের সিং আর উড়ের প্রাধান্য উড়ে গেছে—সব মিলে মিশে যে জগাখিচুড়ি হয়েছে তা নিছক বাঙালীত্ব ছাড়া কিছু না। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্য আর দৈবিক যা কিছু সব এক এক আনা করে নিয়ে মিশিয়ে ষোলো আনা করতে পারলে এবং তার উপরে স্বকীয় বুদ্ধি আরো আনা দুয়েক যোগে আঠারো আনা করলে তখনি অত্যাশ্চর্যরূপে বাঙালীয়ানা পাওয়া যায়।

এ তো গেল বাঙালীর ভৌগলিক রূপ। এসব গোলমাল বাদেও বাঙালীর পরিষ্কার সাংস্কৃতিক রূপ আছে। ঐতিহাসিক সূত্রেও আমরা বাঙালীকে পেতে পারি। প্রাক-উপনিষদের যুগ থেকে আরম্ভ করে বৈদিক, বৌদ্ধ, শাঙ্কর, মোগলাই, ইংরেজী ইত্যাদি বিভিন্ন হুজুগ পেরিয়ে পাঁচশো বছর পরেকার অনাগত সময়ে ছিটে-ফোঁটাও খুঁজলে পাওয়া যাবে আমাদের মধ্যে। ধরাধামের

আর নিরবচ্ছিন্ন কালের যাবতীয় আইডিয়ার আমরা আইডিয়াল রূপ-সর্বপ্রকার ঐতিহ্য এবং আদর্শের খর্বাকার প্রতিমূর্তি। পার্থিব বিদ্যা-বুদ্ধি-ভাষা-কৃষ্টির সঙ্গে অপার্থিব প্রতিভার সমন্বয়ে, আমরা বাঙালী।

'তা তুমি কি কেবল বোমার ঝামেলাতেই পালিয়ে এলে, নাকি, অন্য কষ্টও ছিল?'

'হ্যাঁ, অন্নকষ্টও দেখা দিল বই কি। খাওয়া-দাওয়ার ভারী কষ্ট হতে লাগল।'

'বর্মায় অন্নকষ্ট—বল কি! শুনেছি সে যে সোনার দেশ—এই বাংলাদেশের মতনই নাকি! ধানচালের তো সেখানে অভাব নেই ভাই!'

'তা তো নেই!'—বিক্রম সিং থামে। বোধহয় সমস্যাটা ভাষায় প্রকাশ করার মত ক্ষমতায় কুলিয়ে উঠতে চেষ্টা করে।

'তবে কি সেখানেও রাজায় মন্ত্রীতে কোটালে আর সওদাগরে ষড়যন্ত্র নাকি? কথামালার দেশের হবুচন্দ্র গবুচন্দ্রের যন্ত্রণা—সেখানেও?'

'ঠিক তা নয়। খাবার-দাবার আছে, কিন্তু কিনব কী দিয়ে? টাকা নেই তো! টাকারই দুর্ভিক্ষ।'

'সে আবার কি? সে তো কেবল আমাদের—এই লেখকদেরই একচেটে জিনিস। তোমাদের টাকার অভাব কেন?...তুমি কি লেখক?'

'তাহলে শুনুন তবে। আমার বাবা অনেক টাকা রেখে গেছলেন—কয়েক লাখ টাকার কোম্পানীর কাগজ—আমাদের দুই ভাইয়ের জন্যে। বাবা মারা যেতে টাকাটা আমরা ভাগাভাগি করে নিলাম। দাদা আমার উড়নচণ্ডী—তাঁর ভাগের টাকা মদ খেয়ে ফুঁকে দিলেন। তারপর পাছে তিনি আমার থেকে ধার নিতে শুরু করেন সেই ভয়ে দাদার সঙ্গে আমি আড়ি করে দিলাম। এ ছাড়া আমার কিন্তু কোনও দোষ ছিল না। সমস্ত টাকা আমি জমিয়ে রেখেছিলাম। পাই-পয়সা পর্যন্ত খরচ করিনি, এমন সময় যুদ্ধটা বাধল।

'জাপানীরা এক ধাক্কায় ব্রহ্মদেশটা দখল করে নিল—আমি ভারী ফাঁপরে পড়ে গেলাম। জাপানী আমলে ইংরেজী কোম্পানীর কাগজের দাম থাকল না—যা দাম থাকল, তা নামমাত্র'—বিক্রম সিং দম নেবার জন্য থামল।

দামটা জানার কৌতূহল হয়—নিষ্কাম কৌতূহল যদিও। আমার কোন কোম্পানীর কাগজ নেই—কেনাবেচার উৎসাহও নাস্তি, কিছু নামগন্ধ না, তবু কোম্পানীর কাগজের অনেক নাম—যোজন-গন্ধা খ্যাতি। তার নামমাত্র দামটাও না জানি কত বা!

'সে আর বলে কি হবে?' বিক্রম সিং মুখবিকৃত করে। 'সে কোনও দামই নয়। কোম্পানীর কাগজগুলো প্রথমে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে চার ধারে ছড়িয়ে ফেলতে হয়, তারপরে টুকরিতে ভরে বেচতে হয় কাগজওলার গুদামে—ছেঁড়া কাগজের যা দাম।'

ঠিক এইভাবে আমি অদ্যতনী গদ্যকবিতা লেখার চেষ্টা করেছি। যে-কোনও

দৈনিক, মাসিক কি সাপ্তাহিক পত্রের যে-কোনও একটা পাতা বেছে নিতে হয়। এমন কি, মশলাবাঁধা কাগজ বাংলা ভাষাভাষী হলে তার দ্বারাও বানানো যায়। প্রথমে সেই কাগজটিকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে টুকরোগুলিকে শূন্যের দিকে ছুঁড়তে হবে।

রচনাকে শূন্যগর্ভ করবার জন্যও বটে এবং কিছুটা রচনার নৈপুণ্যের খাতিরেও বইকি। তারপর সেই ছেঁড়া টুকরোগুলিকে ইতস্তত থেকে কুড়িয়ে এনে পরের পর সাজিয়ে যাও—পছন্দমত ছোট-বড় লাইনে। কবিতা মাপসই হওয়া দরকার। কমা সেমিকোলন দাঁড়ি প্রভৃতি ইচ্ছামত দেবে। ড্যাস ও ফুটকি প্রয়োজন-মাফিক। তারপর নিজের রুচির আন্দাজে 'কাস্তে বাদুড় কাকের বীর্য' ইত্যাদি একটু ছিটিয়ে নিলেই মুখরোচক একটি আধুনিক কবিতা প্রস্তুত হল। কাকস্য পরিবেদনা সেই রচনা নিয়ে সম্পাদককে তাড়া করুন তারপর। এ-জাতীয় কবিতা লিখতে বেগ পাবার কিছু নেই, তেমন জোর থাকলে একটানে এক টনও লেখা যায়। কেবল যে গদ্য-সাহিত্য ভেঙেই রচনা করতে হবে, তারও কোন মানে নেই—শেয়ারমার্কেট রিপোর্ট, সমরাঙ্গনের খবর, সম্পাদকীয় স্তম্ভ, নিজস্ব সংবাদদাতার বার্তা এসবের থেকেও বানানো যায়—এমন কি, এক গদ্য-কবিতা ছিঁড়েও এইভাবে আরেক গদ্য-কবিতা নিয়ে আসা চলে। একটাই যে আসবে তার কোন স্থিরতা নেই, বীজানুর ন্যায় নিজগুণে দ্বিগুণ ভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। একই তুলোকে বারংবার পিঁজে ধুনে, সাজানোর হেরফেরে অতুলনীয় নতুন নতুন কবিতা আমদানী করা যায়। এসব কবিতার মাথামুণ্ডু থাকে না বটে, কিন্তু কবিতায় সে-বালাই না-থাকাই ভালো নয় কি? বাণীর এ এক ছিন্নমস্তা রূপ—নিজের কণ্ঠসুধা পানে নিজেই বিভোর, কেবল অঙ্গভঙ্গীর একটুখানি ধড়ফড়ানি আছে এই যা।

কোম্পানীর কাগজের এহেন কবিতা-সুলভ দুর্দশায় আমার দুঃখ হয়। 'কেন, ওগুলোর কি এক পিঠও সাদা থাকে না? তাহলে তো লেখা যায় বেশ।'

'এইভাবে কোম্পানীর কাগজ বেচে কত আর ইয়েন পাব? ক'দিন তাতে চলে আব? আমার দাদার কিন্তু বরাত গেল ফিরে। যে সব মদের বোতল দাদার জমেছিল—মদ খেতেন আর বোতলগুলো বাড়ির পেছনে বাগানে ফেলে দিতেন তো—তাই বেচে দিব্যি চলতে লাগল। বোতলের দাম বেড়ে গেল অসম্ভব। বলব কি মশাই, ভাঙা কাঁচ পর্যন্ত পড়তে পেল না—একেবারে আগুন। বোতল বেচে দাদার দশ লাখ টাকার ইয়েন হয়ে গেল—আঙুল ফুলে কলাগাছ! নিজেই গায়ে পড়ে ঝগড়া করেছিলাম, আর তো দাদার কাছে গিয়ে হাত পাততে পারি না। বাধ্য হলাম ভারতবর্ষে পালিয়ে আসতে। তবে এসেছি এক মতলব নিয়ে।'

'কী মতলব?'

'মিত্রশক্তিকে উসকাতে, যাতে চটপট বার্মাটাও ওঁরা জিতে নেন—জাপানী-দের বরং সওয়া যায়—কিন্তু দাদার বোলবোলাও তো আর সহ্য হয় না বাবা।'

'আর সেই সাথে তোমার কোম্পানীর কাগজের কপাল ফেরাতে?'

'সে কি আর আছে?' বিক্রমের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। 'খেয়েদেয়ে চা গরম করে ফ্রুকে দিয়েছি কবে। তবে দাদার ইয়েনের কাঁড়িরও সেই দশা হোক এই আমি চাই। জাপানীরাও তো কাগজই গছিয়েছে মশাই—স্রেফ কাগজ।'

'তোমার দাদার সঙ্গে বোধহয় তুমি পেরে উঠবে না বিক্রম। নিশ্চয়ই তিনি সমানে মদ টেনে যাচ্ছেন—এখনও, দ্ব'লাখ টাকার মদের বোতল বেচে যদি দশ লাখ ইয়েন হয়ে থাকে—দশলাখ ইয়েনের বোতল কতগুলো হবে আমার ধারণা হয় না। একটার পর একটা সাজালে হয়তো বিষুব-রেখা বেষ্টন করে আসবে মনে হয়। যতদিনে আমরা বর্মায় গিয়ে পড়ব ততদিনে তোমার দাদার সমস্ত ইয়েন ফাঁক, বিলকুল খতম, থাকবে খালি বোতল। আর সে বোতলের দাম তখন আরও দশ গুণ বেশী।'

ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে বিক্রম হায় হায় করতে থাকে। আমার এক বাঙালী বন্ধু এই কথাই বলত বটে। বলত যে, যে খায় চিনি তাকে যোগায় চিন্তামণি।' সে সকাতরে জানায়।

চিন্তামণিকে চেনা দায়! ওর দাদার চিনি যোগাবার জন্য এতবড় একটা যুদ্ধই তিনি বাধিয়ে বসলেন। এতজনের দুঃখ-দৈন্য-নির্যাতনের কথা চিন্তাও করলেন না। ভাবলে চিন্তিত হতে হয় বইকি। কিন্তু সে চিন্তার চেয়েও ওর চিন্তাটাই এখন বড়।

'তোমার বার্মা থেকে পালিয়ে আসার পথে কোন কষ্ট হয় নি?' ওর দুঃখ ভোলাতে আমি অন্য কথা পাড়ি।

'কষ্ট হয়নি? খুব কষ্ট। তার ওপর একজন আমার পিছু নিয়েছিল আবার —তার চোখ এড়াতেই—'

'জাপানী গেস্টাপো বুঝি? আমি guess করি।

'গেস্ট—কী বললেন? তা গেস্ট বলা যায় হোস্টও বলা যায়—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।'

'তা যা বলেছ একবার ছুঁলে আঠারো ঘা, চিরকালের জন্য ঘায়েল। তার ওপরে নাছোড়বান্দা আত্মীয়তা। আমাদের এখানকার বন্ধুরাও কিছু কম যান না. প্রায় সগোত্রই বলতে হয়।'

'হুম্।' বলে বিক্রম সিং অস্বাভাবিক রকম গুম্ হয়ে গেল।

না. ছেলেটি মন্দ নয়। শিক্ষিত. বিনম্র. ভদ্র এবং সাধু ভাষায় যাকে বলে, কৃষ্টিবান। তবে তেমন দূরদৃষ্টিবান নয় বলেই মনে হয়। সেটা অবশ্য বয়সের দোষ। চালসে পড়ে চোখ ঝাপসা হয়ে আসবার সাথে সাথে যথাসময়ে আসল দৃষ্টি খুলবে। এখন জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দানে কোনও ফল নেই—চল্লিশের আগে তা খোলতাই হবার নয়। এখন হাজার ওকে চোখা করবার চেষ্টা করলেও গুরুর-উপর-টেক্কা-মারা গুরুতর কোনও পরাকাষ্ঠার সম্ভাবনা নাস্তি। চক্ষু-বানও হতে পারবে না, চক্ষুদানও করতে পারবে না।

'একগাদা বই যোগাড় করেছেন দেখছি।' মনের গুমোট কাটলে আমার বইয়ের শেলফের দিকে সে তাকালো। 'সেকেন্ডহ্যান্ড বইয়ের দোকানের মত দেখাচ্ছে, তাই না? এর যদি সব আপনি পড়ে থাকেন, তাহলে খুব শিক্ষালাভ করেছেন বলতে হবে।'

'বিশ্বকোষ, রাজতরঙ্গিণী, শব্দকল্পদ্রুম এইরকম খানকয়েক বাদে প্রায় সব বই-ই পড়ে দেখেছি বলতে পারো! কয়েক পাতা করে প্রায় সবই আমার ওলটানো।'

'উঃ! কী ভয়ংকর পড়াশুনা আপনার! আপনি পণ্ডিত লোক।' ওর দু-চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আমি লজ্জিত হয়ে অন্য প্রসংগ পাড়ি। আত্মপ্রশংসা আমার সয় না—একেবারে আধমরা করে দেয় আমার।

'বাড়ির এরা সব গেল কোথায়? কাউকে দেখছিনে যে, কোথায় গেছে বললে?' আমি জিজ্ঞাসা করি।

'মা-র কথা বলছেন? তিনি একটু বাজার করতে গেছেন।'

'মা?' এবার দ্বিতীয় দফা আমার চোট্ লাগে। আবার দম আটকে আসে আমার। কল্পনাকে মাতৃতুল্য—মানে, অন্য কারো মাতৃস্থলাভিষিক্ত ভাবতেও হোঁচট খাই। এমন একটি বৃহদাকার বালককে আমার কাল্পনিক তনয় বলে ধারণা করতে পারি না।

'হ্যাঁ', বলে ও। 'আপনি তাঁকে চেনেন নিশ্চয়ই। ওই যে'—দেয়ালে কল্পনার ফটোর দিকে সে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে। 'ওইখানে।'

'তুমি কি মা বলো নাকি ও'কে?...'

'বাঃ, মা-ই তো! কেন নয়? আমাকে পোষ্যপুত্র নিয়েছেন বলিনি কি?'

'হ্যাঁ, বলেছিলে যেন মনে পড়ছে। তোমাকে তিনি কি বলেন? বৎস?'

'আমাকে? না, শুধু বিক্রম। তবে বলেছেন আরো একটু ঘনিষ্ঠতা হলে বিকু বলেই ডাকবেন। বিকুটাই বেশি মিষ্টি নাকি।'

উঃ, আমার অবর্তমানে এই একবেলার মধ্যে এতদূর গড়িয়েছে! উই আর লিভিং ইন্ প্রেজেন্স অফ হিস্টোরি—কথাটা মিথ্যে নয় দেখছি। এবং ইতি-হাসের কী তীব্র গতি! এমন তীরবেগে চলেছে তার মারাত্মক ভাঙা-গড়ার পথে যে পদ্মার তীরও তার কাছে কোথায় লাগে। (তটস্থ হয়ে থাকব তার যো কি।)

বিক্রমকে নাইয়ে খাইয়ে শুইয়ে দেয়া হল বাড়তি ঘরটায়। কল্পনাই এসব ঝক্কি পোহাল।

তার পরে ভালো কাজের অব্যর্থ আনন্দে গদ গদ হয়ে বলল, 'আমাদের একটি ছেলে ছিল না, বুড়ো হলে সেবা করবার ছিল না কেউ। এমন একটি ছেলে পাওয়া ভাগ্যের কথা। ভালই হল, কী বল?'

'অর্থাৎ এখন আমাদের সেবা করার মত একটা হল এই বলছ তো? মানে,

আমাদের সেবা—আমরাই সেবা করব যাকে এখন—যার সেবা করতে করতে বুড়ো হয়ে যাব আমরা, তাই না?' কল্পনার কথাটাকেই আমি ভাষান্তরে প্রকাশ করি।

'কী যে বল', কল্পনা বলে, 'চমৎকার ছেলে আমাদের বিকু।'

ওর চমৎকারিত্বের বিরুদ্ধে কিছুই আমি বলি না। এবং আরো আমাদের চমৎকৃত করে দিল সে পরদিন প্রত্যুষে। তখনো ভাল করে ভোর হয়নি, দরজায় কার যেন বিক্রম দেখা গেল। ওই বিক্রমেরই। ওর করাঘাতে, কল্পনার ঘুমের ঘোর আর আমার ঘোরতর ঘুম—দুই-ই ভেঙে গেল একসঙ্গে।

'মা মা। বাবা বাবা। তোমাদের চা বানিয়ে এনেছি। দ্বার খোল।...'

ওর করাঘাতে মাটি হবার আগে চমৎকার এক ডিপ্লোমাটিক স্বপ্ন দেখছিলাম—যুদ্ধের স্বপ্ন, বিপ্লবের স্বপ্ন—এই যুদ্ধ কে বাধালো তারই এক স্বপ্নাদ্য কাহিনী!...

ভগবানের দেখা পাওয়া খুব রোমাঞ্চকর দৃশ্য। একটু আগে সেই ভগবদ্দর্শন ঘটেছিল আমার বরাতে, যদিও স্বপ্নযোগে, কিন্তু তাহলেও...

ভগবান তাঁর সপ্তম স্বর্গে বিরাজ করছেন। চারধারে ভক্তবৃন্দ। চলতি কথায় তাঁদের মোসাহেবও বলা যায়। স্বর্গেও উপসর্গের অভাব নেই—আর, একটু ফাঁক পেলেই তাঁরা ভগবানের স্তবস্তুতি করে নিচ্ছেন।

নিজের পরকালের পথ পরিষ্কার করতে কসুর নেই কারো।

(যদিও, এই পরকালটা এর পরে পৃথিবীতেই এঁদের কাটাতে হবে কিন্তু তাহলেও, স্বভাবদোষে, চিরকালই এঁরা পরকালের জন্যে কাতর। পূর্বকালে যেমন ধরাধামের প্রতি এঁদের বিন্দুমাত্রও রুচি ছিল না, এখন তেমনি—এমনকি তার চেয়েও ঢের বেশী—স্বর্গে এঁদের অরুচি। স্বর্গে বাস করেও এঁরা আরেক স্বর্গের জন্যে লালায়িত।)

ভক্তদের মধ্যে নারদ একটু অম্লমধুর। ভগবানের অপ্রিয় সমালোচনা করতেও তিনি কখনো পেছপা হন না, এই কারণে নারদকে ভগবানের ভারী পছন্দ; মাঝে মাঝে মুখ বদলাতে হলে নারদের মতন চাটনি আর হয় না।

নারদকে জনান্তিকে ডেকে ভক্তদের দেখিয়ে তিনি বলছিলেন—'ওহে, এরা তো এখানে এসে পূর্ববৎ সেই ধান ভানছে। এই সব ধর্মের ঢেঁকিদের এ-বিষয়ে আর বেশি ব্যস্ত হতে না দিয়ে পরলোকে রপ্তানি করার চটপট একটা ব্যবস্থা কর দেখি—'

বলতে না বলতে পরলোকের দিক থেকে দারুণ এক আওয়াজ আসতে শুরু হল। ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, রুশীয়, ইতালীয় ইত্যাদি বিবিধ ভাষার জগাখিচুড়ি—তাকে আর্তনাদের ঐক্যতান বললেও অত্যুক্তি হয় না। উক্ত তানালাপ স্বর্গে পেঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে দেবভাষায় অনূদিত হয়ে, সংস্কৃত রূপান্তরে, 'ত্রাহি মধুসূদন' হয়ে দাঁড়াল।

ভগবান চমকে গেলেন। একি, পৃথিবী থেকে এমন পরিত্রাহি রব আসছে

যে হঠাৎ? কুরুক্ষেত্র লড়াইয়ের সময় এরকমটা শোনা গেছল বটে, কিন্তু তখন তো তিনি স্বয়ং সেখানে সশরীরে উপস্থিত। আর সত্যি বলতে, তিনি নিজেই তো কুরুক্ষেত্র বাধান। তাঁর অবর্তমানে সেরকম কিছু বাধবার তো কথা নয়। এবং যদ্দুর তাঁর ধারণা, এখন পর্যন্ত কোন অংশাংশেও তিনি মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়েছেন বলে তাঁর মনে হয় না—তাহলে—এ আবার কোন্ অবতার? কার অবতারণা?

ভগবান নারদকে খোঁজ নিতে বললেন—'ঘুরে ফিরে দেখে এসো তো হে ব্যাপারটা।'

চরের যা কিছু কাজ নারদের দ্বারাই তাঁর নিষ্পন্ন হত। ত্রিভুবন বিচরণ করে চরাচরের যা কিছু খুঁটিনাটি প্রভুর শ্রীচরণে এসে নিবেদন করাই দেবর্ষি নারদের পেশা ছিল। পেশাও বটে, নেশাও বটে। নগদা খবর না থাকলে তিনি স্বয়ং গোলমাল বাধিয়ে টাট্‌কা-টাট্‌কি বানিয়ে নিতেও দ্বিধা করতেন না। উপস্থিত ভক্তির ঢেঁকিদের একজনকে বাহন করে নিয়ে তক্ষুনি তিনি রওনা হয়ে গেলেন।

খানিক পরেই তিনি ফিরে এলেন খবর নিয়ে। সম্ভবতঃ কোন খবরের কাগজের খবর। ভূপৃষ্ঠে প্রথম যে দেশে তিনি পদার্পণ করেছিলেন, সেই দেশেরই মুখ্যস্থানীয় ব্যক্তির বা কোন জাতীয় মুখপত্রের মন্তব্য বলে মনে হয়।

'হেলশালাসী বলে এক ব্যাটা কাফ্রী ভারী গোল বাঁধিয়েছে প্রভু!' নারদ এসে খবর দিলেন, 'তার জন্যেই দুনিয়ায় যত হাঙ্গামা।'

'অ্যাঁ, আমার শান্তির রাজ্যে অশান্তি বাধায়, এত বড় সাহস তার!' ভগবান অত্যন্ত উষ্ণ হয়ে উঠলেন—'ডা-ডা-ডাকো শা-শা-শালাসীকে।' একটুর জন্যে ভাগবত বাক্যের শালীনতা যেতে যেতেও থেকে গেল। তাঁর মুখের কথা খসতে না খসতে (ভগবান ইচ্ছাময়!) সম্রাট হেলশালাসী এসে হাজির। তাঁকে দেখে, তাঁর কালো রং দেখে, ভগবান আরো বেশি চটে গেলেন। নিজে তিনি কালাচাঁদ বলেই হয়তো কালোদের তাঁর এতই না-পছন্দ। 'তুমি নাকি আমার পৃথিবীকে রসাতলে দিচ্ছ?' এবার সম্রাটের 'হেল্'—অংশটির ওপরেই বিধাতার বেশি চাপ পড়ল।—'যুদ্ধ বাধিয়ে আমার নরক ভর্তি করতে লেগেছ নাকি?'

হেলশালাসী কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'প্রভু, আমি নই, মুসোলিনী। মুসো ব্যাটাই আগে আমার রাজ্য আক্রমণ করেছিল।—এই যুদ্ধ বাধানোর মূলে সেই-ই। আমি আমার রাজ্য আবার ফিরে পাবার চেষ্টা করছি মাত্র।'

'ও, এই?...আচ্ছা, যাও।' হেলশালাসী খালাস্ পেতেই মুসোলিনীর প্রতি তলব গেল।

'প্রভু, মুষল ইনি কে?' নারদ প্রশ্ন করলেন। 'আপনার যদুবংশ যার দৌলতে ধ্বংস হয়েছিল সেই মুষলং কুলনাশনং—এর কেউ কি?'

'খুব সম্ভব। তারই কোন অংশাংশ হবে হয়তো।' বললেন ভগবান। 'হয়তো সেই মুষল সম্পূর্ণ লীন হয়নি—তারই এক ধ্বংসাবশেষ নতুন এক মূর্তি ধরে এই

মুসোলিনী...না দেখলে ঠিক ঠাওর পাচ্ছি না।'

দেখতে না দেখতে মুসোলিনী গাল ফুলিয়ে গট গট করে এসে হাজির।

হেলশালাসীকে যে টেক্কা মারে সে চিড়তনের ওপরে আরেক পোঁচ ইস্কাবন-মার্কাই হবে বিধাতার বোধহয় সেই ধারণা হয়েছিল, কিন্তু ধোপদুরস্ত ধপধপে রং দেখে তিনি সচকিত হলেন। ফরসাদের প্রতি চিরকালই তাঁর কেমন টান—ধরাতলে যত উৎপাতই না বাধিয়ে থাকুক, মুসোলিনীকে খাতির না করে তিনি পারলেন না। সমাদরে বসিয়ে, খুব কিন্তু-কিন্তু হয়ে কথাটা তিনি পাড়লেন।

প্রশ্নপত্র হাতে পাবামাত্র জবাব যেন মুসোলিনীর মুখে লেগেই ছিল।

'আমি যুদ্ধ বাধিয়েছি! কী যে বলেন! আমি যুদ্ধ বাধাব? আমি! আমার মত ঠাণ্ডা নিরীহ ভদ্রলোক আর দুজন আছে নাকি দুনিয়ায়? এ যুদ্ধ বাধিয়েছে চার্চিল। চার্চিলই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। পৃথিবীময় যত অশান্তি আর উপদ্রব দেখছেন কিংবা আপনার কানে আসছে, সে সমস্তর জন্য দায়ী হচ্ছে ওই চার্চিল।'

মুসোলিনী চলে গেল। ডাক পড়ল চার্চিলের।

চার্চিল আসতেই ভগবান উঠে গিয়ে মহা আপ্যায়ন করে তাঁকে আগিয়ে নিয়ে এলেন। মুসোলিনীর বেলা যেটুকু তাঁর সৌজন্যের ব্যত্যয় ঘটেছিল, চার্চিলের বেলায় তা সুদে-আসলে পুষিয়ে দিলেন। আদতে, ধরিত্রীর ভালো-মন্দ যা কিছু, মায় ভদ্রতা পর্যন্ত, সবই তো শ্রীভগবানের থেকেই আমদানি, কাজেই তাঁর ভাঁড়ারে ভদ্রতার অভাব হলে চলবে কেন?

প্রশ্ন শুনে চার্চিল তো চৌচির। তিনি আকাশ থেকে পড়লেন যেন হঠাৎ।—'আমি—আমি যুদ্ধ বাধালাম! মুসোটা এতদূর মিথ্যেবাদী হয়েছে। সত্যি কথা যদি জানতে চান প্রভু, তাহলে বলি। যুদ্ধ একটা বেধেছে বটে, তাতে আমরা জড়িত হয়ে পড়েছি সে কথাও মিথ্যে নয়—কিন্তু সে যুদ্ধ আমরা বাধাইনি। বাধানো দূরে থাক—সে যুদ্ধে আগাগোড়া আমরা বাধা দিয়েছি। এমন কি, এখন পর্যন্ত। এত বাধবার পরেও। আপনার যদি সন্দেহ থাকে, আমাদের পূর্বতন কর্মকর্তা, ছত্রপতি চেম্বারলেন তো এখানেই কোথাও—স্বর্গে কিংবা নরকে—রয়েছেন, তাঁকে ডেকে এনে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

এই বলে চার্চিল, মুসোলিনীর দেড়া গাল ফুলিয়ে অভিমানভরে বসে রইলেন গোঁজ হয়ে।

চেম্বারলেনের খোঁজ হল, কিন্তু ঐ নামে স্বর্গে উপসর্গে বা বিসর্গে কিংবা আশেপাশে কোথাও কারো পাত্তা পাওয়া গেল না। কাছাকাছি নামের একজন ছিল বটে, কিন্তু সে ঘাড় নেড়ে বিধাতার আক্রমণ প্রত্যাখ্যান করেছে। বলেছে যে—'কী বললে? চেম্বারলেন? হ্যাঁ, ঐ ধরনের একটা নাম আমার মনে পড়ছে বটে। আমারই না কার যেন ছিল মনে হয়। বোধহয় আমারই ছিল—ঠাওর হচ্ছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার ওপর দিয়ে বিস্তর যে ঝড়-ঝাপটা গেল—এই পোলাণ্ড,

চেকোশ্লোভাকিয়া, বেলজিয়াম, নরোয়ে—এই সব ধাক্কা চলে যাবার পর—এখন আমি সেই চেম্বারলেন নেই। সামান্য লেন নই আর আমি—আমি এখন রীতিমতন চেম্বার রোড।'

ছত্রপতিকে স্বচক্ষে দেখে আমিও বিস্মিত হলাম। চেনা শক্তই বইকি! রোড না বলে ব্রডওয়েই বলতে হয়। এমন কি বাঁকা চোখে নয়, সোজাসুজি তাকিয়েও চেম্বার আভি New ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

চার্চিল বললেন, 'বেশ, চেম্বারলেন না আসেন তিনি যদি চেম্বার রোড হয়ে থাকেন হোন গে—আপনি আমার সহযোগী স্ট্যালিনকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন। তাহলেই জানতে পারবেন, কে যুদ্ধ বাধিয়েছে। আমি নিজমুখে কিছু বলতে চাই না। য়ুরোপেই বা কারা যুদ্ধ বাধালো আর এসিয়াতেই বা কারা? এবং শুরু এস্তক কারা কেবল বাধা দিয়ে আসছে? হংকং, সিঙ্গাপুর, শ্যাম, মালয়, ব্রহ্মদেশ,—এর কোনখানে যদি আমরা যুদ্ধ বাধিয়ে থাকি, যদি তার প্রমাণ পান, তাহলে বলবেন আমায়। আরে মশাই, শত্রু কাছে এলে—শত্রুকে কাছাকাছি পেলে তবে তো যুদ্ধ করব? ডানকান থেকে আরাকান পর্যন্ত কোথাও যদি আমাদের বিরুদ্ধে তেমন অভিযোগ করার এক ফোঁটাও কিছু পান তখন আমাদের বলবেন। আমরা কাটা কান ঢাকা না দিয়েই পাড়ার মাঝখান দিয়ে হাঁটছি—এবং সেজন্যে আমরা মোটেই লজ্জিত নই। যুদ্ধ আবার ভদ্রলোকে করে!'

চার্চিল চলে যেতেই স্ট্যালিন এসে হাজির।

ভগবান স্ট্যালিনকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন—কিন্তু অর্ধোত্থিত হয়ে, তক্ষুনি কি ভেবে বসে পড়লেন ফের। চেপেই বসলেন বেশ করে। স্ট্যালিন বেশি কথার লোক নন। চার্চিলের মত তাঁর বাগ্মিতার বহর নেই। দু'কথায় নিজের কথাটি সেরে নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

স্ট্যালিনের কাছ থেকে জানা গেল, চার্চিল নয়, হিটলারই এই যুদ্ধ বাধানোর জন্য দায়ী। এবং স্ট্যালিনের সামান্য বিবৃতির ভেতর থেকেই হিটলারের স্বরূপ জানতে তাঁর বিশেষ অসুবিধা হল না।

ভাবগ্রাহী জনার্দন তো!

হিটলারও এল সবশেষে।

কিন্তু ভগবান হিটলারকে দেখে উঠে খাতির করা দূরে থাক, নিজের চেয়ারে দিব্যি গ্যাঁট হয়ে বসে রইলেন। একটু নড়লেন না পর্যন্ত। বসতেও বললেন না তাকে।

হিটলার হাত-পা নেড়ে হৈ-চৈ করে কী যে বলল তার একবর্ণও আমাদের মগজে ঢুকল না। ডান কান দিয়ে ঢুকে আরাকান হয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু কিছু বোঝা না গেলেও এই যুদ্ধ যে সে-ই বাধিয়েছে, তার দুশানাট্য থেকেই, সেকথা বুঝতে কোন বেগ পেতে হল না। হি ওয়াজ প্রোটেস্টিং টু মাচ।

হিটলার অন্তর্হিত হলে দেবর্ষি নারদ ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন—

'লীলাময়, তোমার লীলা বোঝা ভার! তুমি হেলশালাসীকে বা কেন অমন উপেক্ষা করলে, তাকে মাটিতে বসিয়ে রেখে মুসোলিনীকেই বা অমন আপ্যায়ন করলে কেন, আর চার্চিলের প্রতিই বা তোমার অতখানি খাতির কিসের? যদি বলো যে ভদ্রতায় খাতির, তাহলে স্ট্যালিনের বেলাই বা তার অন্যথা হয় কেন—আর হিটলারের বেলায় তোমার এই ভদ্রতাবোধ উপে যায় কোথায়? এর রহস্য বিশদ করে জানবার আমার বাসনা হয়, দয়াময়।'

দয়াময় মুচকি হেসে বললেন—(বৈকুণ্ঠে শুয়ে স্বপ্নযোগে সেই কথামৃত আমি শুনলাম)—'হেলশালাসীর কথা তুমি বোল না। যা কালো রং! ওর সঙ্গে ভদ্রতা-অভদ্রতার কোনো কথাই ওঠে না। আর সেই কারণেই মুসোলিনীর প্রতি ভদ্র না হয়ে পারা যায় না। তা ছাড়া মুসোলিনীকে ভয় কিসের? দেখতে মুষলপ্রায় হলেও, ওকে হটাতে বেশিক্ষণ লাগে না। ও আমার কোনো ক্ষতি করতে পারত না—সেইজন্যই ওর সঙ্গে একটু ভদ্রতা করলাম। আর চার্চিলকে খাতির করতেই বা বাধা কি? ওদের অগাধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য—সেই টুকু কোনো রকমে বজায় রাখতে পারলেই ওরা খুশি—তার বেশি ওদের খাঁই নেই আব। কিন্তু স্ট্যালিন! বাবা, ওকে মোটেই বিশ্বাস হয় না। উঠতে গিয়েই তক্ষুনি বসে পড়েছিলাম কেন জানো? যদি সুযোগ পেয়ে সেই ফাঁকে আমার গদি পালটে দ্যায়? দুনিয়ার হালচাল বদলে দেয় যদি? আর হিটলার, বাপ্‌স! ওর কাছে তুমি ভদ্রতা রক্ষা করতে বলছ? ওর সামনে উঠলে কি আর রক্ষা ছিল? তক্ষুনি সে আমাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই আমার চেয়ার দখল করে বসত না? যা ওর হুমকি—দেখলে তো। তেমনি ওর রাজত্বের লোভ! বাবাঃ! তাহলে কি আর আমায় দেখতে পেতে এখানে? ওরই কোন কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্পেই আমাকে অদর্শন হতে হত এতক্ষণ!'

স্বপ্নপথে এই পর্যন্ত এগিয়েছি, এমন সময়ে কর্ণকুহরে বিক্রমের স্বাব খোলো, চা এনেছি, কুহরিত হতে লাগল। ওর চেঁচামেচি বন্ধ করার জন্য বাধ্য হয়ে উঠে দরজা খুললাম।

প্রকাণ্ড ট্রে হাতে প্রবেশলাভ করলে দেখা গেল সে ঢের কমিয়ে বলেছে; চা, কফি, কোকো, তিনটেই সে বানিয়েছে। কোন্‌টা আমরা সকালে পান করি জ্ঞান না থাকায় তাকে যে-ক'টা পেয়েছে সবই সে পানীয়ে প্রযোজনা করেছে। এবং প্রত্যেকটাই তিনজনের মত, আঢেল পরিমাণে।

কিন্তু কোন্‌টা খাই? কাকে ফেলে কাকে নিই? কাকে রাখি কাকে চাখি? বিক্রমই উপায় বার করল—চা, কফি, কোকো, দুধ আর চিনি মিলিয়ে অদ্ভুত এক পাঞ্চ্‌ বানাল, ওর দাদার নাকি পাঞ্চ্‌ ভারী পছন্দ, আমরাও তাই গরম গরম সেই পাঞ্চ্‌ খেলাম।

বিক্রম-সম্পাদিত সেই পঞ্চামৃত খেয়ে সাবাদিন আমাদের কারো খিদে পেল না, আর কেমন গা বমি বমি করতে লাগল। কিন্তু বিক্রম খুব খুশি, স্বদেশে থাকতে ক্ষুধাহারী এই সুধা কেন সে আবিষ্কার করতে পারেনি এই শুধু

তার আপসোস। তাহলে কেবল তার একার নয়, আর পাঁচজনের জন্যও এই পাঞ্চজন্য ছাড়তে পারত—

সারা মগের মুল্লুকের মগে মগে যার সাড়া ছড়িয়ে পড়তে দেরি হত না। কাল আবার সে এই মিশ্র পানীয় বানাবে, আমাদের শাসিয়ে রেখেছে। এমন সুপেয় নাকি আর হয় না। দয়ানিধি আমাদের রক্ষে করুন!

বিছানায় শুয়ে শুয়েই আওয়াজ পাচ্ছিলাম পাশের ঘরে বিক্রম আওড়াচ্ছিল —'আপনি তো বলছেন খালি হ্যালো আর হ্যালো, কিন্তু কত আর হেলব মশাই। হেলতে হেলতে তো মাটিতে শুয়ে পড়েছি পেরায়, আবার কোথায় হেলব?'

বলে কি বিক্রম! কিসের হেলা-ফেলার কথা বলছে ও? না, আর অবহেলা করা গেল না। সকালের সুখশয্যা ফেলে উঠতে হল।

পাশের ঘরে গিয়ে দেখি টেলিফোনের রিসিভার হাতে নিয়ে বিক্রম ধরাশয্যায় প্রায় অর্ধশায়ী।

'কী হচ্ছে বিক্রম?'

'এই দেখুন না! এই ভদ্রলোক। ক্রিং ক্রিং করতেই টেলিফোনের সাড়া দিয়েছি, কিন্তু উনি আর কোন কথা নয়, খালি বলছেন, হ্যালো আর হ্যালো! কিন্তু কত আর হেলা যায় বলুন?'

'দেখি তো আমি—' ওকে নিষ্কৃতি দিয়ে রিসিভারটা নিয়ে কর্ণপাত করলাম..., 'হ্যালো। কে কথা বলছেন আপনি?'

টেলিফোনের আওয়াজ ঃ 'এটা কি হগ সাহেবের বাজার?'

'কী বলছেন?'

'এটা কি আপনার হগ সাহেবের...?'

'হগ সাহেবের বাজার, ওরফে নিউমার্কেট..তাই কি চাইছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আজ্ঞে না। রং নম্বর।' বলে রিসিভার রেখে দিলাম।

ইচ্ছে হল একবার টেলিফোন-অপরেত্রীকে ডেকে বলি কথাটা।

'কেন রং দিলি এ ঢং করে' গানের কলিটা তার কানের ওপর দেগে দিই একবার, কিন্তু ভেবে দেখলাম—লাভ কি? দূরভাষিণী মেয়েদের বেশির ভাগই রং-কানা, সে কথা আমার মতন কার আর বেশি জানা? দুনিয়ার যত রং নম্বর তারা আমার ঠিকানাতেই ছেড়ে দেয়—সারা দিন-রাত এত্তেলা দিতে দিতেই চলে যায় আমার—লিখতে বসার ফুরসৎ পাইনে। কিন্তু সত্যিই কি কোনো প্রতিকার নেই এর...?

আবার টেলিফোন ক্রিং ক্রিং করে গর্জে ওঠে।...

'হ্যালো...?'

'এটা কি হগ সাহেবের বাজার?'

সেই কণ্ঠস্বর—সেই ব্যক্তিই আবার। আবার সেই রং নম্বর।

'নাঃ, এবার অন্য পথ ধরতে হবে। বিষ দিয়েই বিষক্ষয় করা যায় কিনা... দেখা যাক। 'হ্যাঁ, বলুন। কী চাই আপনার বলুন?

'আমার কতকগুলো ডিমের দরকার ছিল।'

'কী বললেন? সীমের দরকার? আজ্ঞে, এটা তো তরকারির বাজার নয়। আমাদের হচ্ছে চুড়ির দোকান।'

'চুরি? চোরাই কারবারের কথা বলছেন?'

'আজ্ঞে না। চুরি করা নয়। চুড়ি পরার ব্যাপার। এখান থেকে হকাররা চুড়ি কিনে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ফিরি করে—বাড়ি বাড়ি চুড়ি পরায়। আপনি কোনো ফেরিওলা?'

'নন্‌সেন্‌স্‌!'

'কী বললেন—রাজী আছেন? তাহলে আবেদনপত্র হাতে চলে আসুন চটপট। কিন্তু তার আগে একটা কথা ..'

'কিসের কথা?'

'কথা এই যে আপনার চেহারাটা কেমন? চুড়ি ফিরি করা যার-তার কম্ম নয় মশাই! চেহারাটা একটু ছিমছাম-চলনসই হওয়া চাই। বেশ স্মার্ট হওয়া দরকার। একটু ফিটফাট থাকাও চাই সঙ্গে সঙ্গে। কেবল চেহারাটা বেশ নয় —বেশভূষার পরিপাট্যও বাঞ্ছনীয়। নইলে, যার-তার হাতে মেয়েরা চুড়ি পরতে চাইবে কেন? পাণি গ্রহণের ব্যাপার, বুঝলেন কি না! আর কেমন ওসব পাণি, বুঝতেই তো পারছেন!'

'ড্যাম ইওর চুড়ি।'

'তা যা বলেছেন! একেবারে ছ্যাডাং ডাডাং ড্যাম। গলিতে গলিতে চুড়ি পরাতে গিয়ে অনেক সময় নরবলি হয়ে যায় বইকি। চুড়ি পরানোর ফাঁকে হৃদয় চুরি হয়ে যায় মশাই—এই পাণি গ্রহণ সেই পরম পাণিগ্রহণে গিয়ে দাঁড়ায়। একেবারে মোক্ষম ব্যাপার। তা তাকে আপনি সম্প্রদান বা বলিদান যাই বলুন!'

'কে বলছে সেকথা?'

'সেই কথা বলছেন? সাধারণতঃ দুপুর বেলার দিকেই এই কাজটা—সে সময়টা বাড়ির কর্তারা বাইরে থাকেন সব। রবিবারটা বাদ—বিলকুল বরবাদ। সেদিন ছুটির দিন—কর্তারা সব বাড়ি থাকেন সারাদিন. সেদিন চুড়ি নিয়ে ছুটোছুটি করে লাভ নেই। সেদিন স্বচ্ছন্দে আপনি আপনার অন্যান্য কাজকম্ম...।'

'চোর কাঁহাকা!'

'স্বচ্ছন্দে। রোববার দিন চুড়ির কারবার বন্ধ। সেদিন চুড়ি নিয়ে কোন মেয়েকে পীড়াপীড়ি—কোনো মেয়ের পাণিপীড়ন করতে বলব না আপনাকে আমরা।'

'শাট্‌ আপ্‌।'

'সেদিন আপনার পকেট কাটার কাজ স্বচ্ছন্দে আপনি করতে পারেন। অন্য

চুরিচামারিও চলতে পারে। কোনো বাধা নেই। আমরা তাতে আপত্তি করব না।'

কে চেয়েছে চুরি করতে? কে? শুনি?'

'কে চায় না? অনেক বড় বড় বাড়ির ছেলে—অনেক মিত্তির বোস চক্রবর্তী—বহুৎ বড়লোক মেজলোক ছোটলোক—আমাদের এই ফিরির ফিকিরে জড়িত রয়েছেন, খবর রাখেন তার? আপনি তো ভারি! বলি, কাজখানা কেমন? চুড়ি পরানোর সাথে সাথে মন চুরি পর্যন্ত হতে পারে—জানেন তো? অবশ্যি পরাতে জানা চাই। নরম নরম হাত আর হাতে হাতে লাভ। একেবারে নগদা-নগদি। বলি, ওমর খৈয়াম পড়েছেন?—'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক।'—

নেপথ্যবর্তী (কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ন কণ্ঠে) : 'জানেন, আমি একজন অধ্যাপক? আমার বয়স পঁয়ষট্টি বছর?'

'তাহলে পঁয়ষট্টি দিন। কোনো আশা নেই আপনার। আপনাকে আমাদের দরকার হবে না। কোনো মেয়েই আপনার হাতে চুড়ি পরতে—মানে, আপনার সঙ্গে চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হতে চাইবে না।'

'তাহলে উপায়? আমার যে এক কুড়ি ডিমের খুব প্রয়োজন ছিল—।'

'আচ্ছা দাঁড়ান একটু। আমাদের পাশেই এই মার্কেটের এনকোয়ারি আপিস—তার সঙ্গে যোগাযোগ করে দিচ্ছি আপনার। তাদের কাছেই খোঁজ পাবেন সব। ধরুন একটুখানি।'

'আঃ, বাঁচালেন মশাই। কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব—'

টেলিফোন রেখে একটু হাঁফ ছেড়েছি, বিক্রম প্রশ্ন করে বসল—'লোকটাকে তুমি চুরি করতে বললে বাবা? কাজটা খুব খারাপ হল না?'

'হ্যাঁ, বললেই শুনছে কি না সে। চুরিতেই থেমে থাকবার পাত্র কিনা কেউ!

চুরির পর জোচ্চুরি করবে, তারপর বাটপাড়ি, তারপরে আরও ওস্তাদ হয়ে ডাকাতি রাহাজানি—কিন্তু সেইখানেই থামবে না। শ্রাদ্ধ গড়াবে আরো। আরও বহুদূরে সে যাবে। সহজে নিরস্ত হবার লোক নয় কেউ।'

'কিন্তু কাজটা— বিবেকের বৃশ্চিক বুঝি ওকে দংশন করতে থাকে।

'বলি প্রথম ভাগ পড়েছ তো?' আমি শুধাই, 'পড়েছ প্রথম ভাগ?'

'কে না পড়েছে? বাঙালীর ছেলে হয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগ পড়ব না?'

'প্রথমে কী পড়েছ? অজ আম। কিন্তু সেই অজ আম ধরেই কি কেউ বসে থাকে? তারপর আরও এগোয়। গোপাল অতি সুবোধ বালক, বেণী অতিশয় খারাপ ছেলে—এদের ছাড়িয়ে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত সেই মাসিতে গিয়ে—তার ফাঁসির কারণে পৌঁছে, তবে থামে।'

'মাসি, তুমিই আমার ফাঁসির কারণ।' পুলকিত হয়ে সে স্মৃতিসাগরের পঙ্কোদ্ধার করে।

'তেমনি চুরি তো হাতে-খড়ি। তার থেকে গড়িয়ে সুধী ছাত্র শেষ পর্যন্ত ফাঁসিকাঠে গিয়ে লটকাবে। ইতিমধ্যে সে ছিনতাই থেকে শুরু করে খুন-জখমের কিছু বাকী রাখবে না। ঐ ভদ্রলোককেও থামানো যাবে না হয়তো।'

'কিন্তু এত সব করতে না বলে ওকে কালোবাজারি করতে বললেই পারতে। তাহলে একচোটে সবগুলোই তাঁর করা হত।'

'কালোবাজারীতে?' আমি একটু বিস্মিতই, 'কিরকম?'

'সব জিনিসেরই কালোবাজার হয়। যে সব জিনিস খুব চালু, বাজার থেকে তুলে এনে লুকিয়ে রাখলে, তারপর চাহিদা বুঝে একটু একটু করে দ্বিগুণ, চারগুণ, আটগুণ দরে ছাড়তে লাগালে বাজারে—তার নাম কালোবাজার। জানো না বাবা?'

'এই যুদ্ধের বাজারে কে না জানে?' আমি বলি, 'কিন্তু তুমি বার্মামুলুকের মানুষ হয়ে এ-খবর পেলে কোথায়?'

'বার্মাতেও বেজায় কালোবাজার এখন। দুনিয়ার কোথায় নেই বলো? এক ব্যবসাদার রাজ্যের যত ওষুধ লুকিয়ে রেখেছিল নিজের আড়তে, তারপর ভারী দামে ছাড়ছিল—আমি দেখে এসেছি। সে-সব ওষুধ ফুরিয়ে গেল তখন সে ঐ সবের ভেজাল বার করে কালোবাজারি দামে ছাড়তে লাগল—তাতে মনে করো, তার চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ফেরেববাজি সবই হয়ে গেল একসঙ্গে। ঐ এক কালোবাজারেই। এমন কি, খুন-জখমও হলো শেষটায়।'

'খুন-জখমও?'

'হ্যাঁ। তার ভেজাল ওষুধের ইন্‌জেকসন নিয়ে কতলোক যে মারা পড়ল সঙ্গে সঙ্গে, কত জনার পক্ষাঘাত হল, তা বলা যায় না। এমনকি, অন্য অন্য জেলার তার আত্মীয়-বন্ধুরাও না জেনে সেইসব ওষুধ খেয়ে মরে গেল কত জনা। তাই বলছিলুম যে, এক কালোবাজারেই সব কিছু হয়ে যায়...তাই যদি লোকটাকে—'

এমন সময় টেলিফোনটা ক্রিং ক্রিং করে উঠল আবার।

রিসিভার ধরে সাড়া দিলাম—'হ্যালো?'

'এই যে আপনি!' পরিচিত স্বর আপ্যায়িত সুরে ধ্বনিত হল—'খবর নিলেন এনকোয়ারিতে আপনাদের? আমার যে এককুড়ি ডিমের বড্‌ডো দরকার বললাম।'

'সীমের কথা বলছেন তো?'

'সীম! সীম নিয়ে আমি কী করব?'

'কেন, কবিতা? কবিতাই করা যায় তো। স্বয়ং রবিঠাকুর করে গেছেন। সীমের মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর। আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।'

'ধুত্তোর! আপনি কিচ্ছু জানেন না। ঠিক ও ধরনের কোনো কবিতাই নেই কবিগুরুর। আপনি উল্টো বুঝেছেন। সীম হচ্ছে খাবার জিনিস। খাননি

কখনো সীম?'

'মনে পড়ছে না। তবে হিমশিম খেয়েছি বটে। অনেক খেয়েছি। হিমশিমও খাবার জিনিস মশাই! তবে একথা আমি বলব, ওটা খেতে মোটেই তত ভালো নয়।'

'সে কথা থাক। আপনি যে বললেন, মার্কেটের এনকোয়ারি অফিসের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করে দেবেন...?'

'এই যে...করে দিচ্ছি কনেকশন...(তার একটু পরেই হেঁড়ে গলায় হাঁক ছাড়ি) হ্যালো...'

'মার্কেটের এনকোয়ারি এটা?'

'হ্যাঁ। পাবেন বইকি। কুকুরের গলার বগলসও পাবেন। তবে একটু খোঁজা-খুঁজি করতে হবে—এই যা। নইলে হগসাহেবের বাজারে কী না মেলে?'

'হগসাহেবের বাজারে যখন সব মেলে বলছেন তখন সামান্য আমার এক কুড়ি ফ্রেশ এগ্‌স্‌...তাও আমি পাবো আশা করি?'

'না, হগসাহেবকে পাবেন না। ফ্রেশ অবস্থাতে তো নয়ই। দুঃখের বিষয়, বহুকাল আগেই তিনি দেহরক্ষা করেছেন। তবে ফ্রেশ হগ আর ফ্রেশ সাহেব আলাদা আলাদা পাওয়া যায় অনেক। নিজে এসে খুঁজতে হবে। খুঁজে পেতে নিতে হবে আপনাকেই।'

'সাহেব নিয়ে আমি কী করব?'

'তবে কি আস্ত একটা মেমই চাই নাকি আপনার?'

'না না—মেম নয়...'

'মেমও নয়, সাহেবও নয়, তবে কী? কুকুরের গলার বগলসও তো আপনি চান না?'

'বগলস নিয়ে আমি কি করব? আমার বাড়িতে আজ একটা ছোটখাট ব্যাপার ছিল, সেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেই একটু...'

'কুকুরের মাংস চাই সেই জন্যে? ভোজের জন্যে কুকুরের মাংস? না মশাই, মাপ করবেন, এ মার্কেট থেকে ও জিনিস সরবরাহ করা হয় না। একটা ভবঘুরে কুকুর, পাঁঠার চেয়ে দামে সস্তা পড়বে কি না বলা কঠিন...আর ধরতে গেলে যদি সে কামড়ে দেয় তো অনেক টাকার ধাক্কা। না মশাই না। কুকুর ধরা আমাদের কাজ নয়। আপনি বরং সি এস পি সি এ-তে খবর নিন। আমরা পারব না। ও কাজে আমরা অপারগ। মাপ করবেন।'

'কুকুরের মাংস কে চেয়েছে? আমার দরকার এক কুড়ি ডিম। বুঝেছেন? আমার চাই ডিম—ডিম...'

'ডিণ্ডিম—যা বাজে? ছেলেদের সেই খ্যালনা নাকি?'

'না, বাজে ডিম চাইনে, ফ্রেশ এগ্‌স্‌। টাটকা ডিম। সীম নয়। ডিম। বগলস নয়, খাবার জিনিস। কবিতা বানাবার বস্তু নয়। রাঁধবার। সীম নয় কিন্তু...বুঝলেন এবার?'

'হিমশিমও নয়। তা সেটা রাঁধবার না হলেও, খাবার বস্তু ছিল...আমার ভারী খটকা লাগছে, বুঝতে পারছিনে ঠিক ঠিক। আমার একজন ওপর-ওয়ালাকে ডেকে দিচ্ছি—মার্কেট ইন্‌স্‌পেক্টারকে। দয়া করে ধরে থাকুন খানিক...'

ওকে সদয় হতে বলে এঘর ওঘর ঘুরে এক আধ গাল ডালমুট চানাচুর চিবিয়ে গায়ের জোর বাড়িয়ে আবার ওর নাগালে আসি।

একটু উঁচা গলায় হাঁক দিই এবার, 'হ্যালো। আমি এম আই—'

অপর পক্ষ একটু হতচকিতই যেন, 'এমাই!'

'হ্যাঁ এম্‌ আই, মার্কেট ইন্‌স্‌পেকটার। কী চাই আপনার?'

'আমি গোটা কতক ডিম চাইছিলুম। এগ্‌স।'

'লেগ্‌স?'

'অ্যাঁ?'

'লেগস চাই আপনার? বেশ তো, ক'জোড়া চাই বলুন? টাকা ফেললে কী না পাওয়া যায় এই কলকাতায়! বিশেষ করে এই হগ সাহেবের বাজারে। তা, কি রকম লেগ্‌স চাই বলুন—ছেলের, না, বুড়োর, না,—'

উক্ত ভদ্রলোক বাধা দিয়ে প্লুতস্বরে কী যেন বলেন বোঝা যায় না।

'লেগের ভাবনা কী? যত দরকার—এনতার যোগানো যায়। এদেশে সবই তো লেগ্‌স মশাই, মাথা আর কোথায়? আমরা ফর্টি ক্রোরস্‌ অফ হেডস না বলে এইটি ক্রোরস্‌ অফ লেগ্‌স বললেই খাঁটি সেন্সাস দেয়া হয় না কি? কিন্তু একটা কথা, প্রত্যেক জোড়া পায়ের সঙ্গে একটি করে মাথা আপনাকে নিতে হবে। মাথার জন্য অবশ্যি বাড়তি কোনো দাম লাগবে না, ওটা অমনি, ফাউয়ের মধ্যেই ধরতে পারেন।'

ঐ আওয়াজ (আর্তনাদে)—'মাথার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক থাক বা না থাক, আমরা তা পা থেকে ছাড়িয়ে আলাদা করতে পারব না। পা আর মাথা পৃথক—সে আপনার নিজের করে নিতে হবে—আমরা পারব না। দেশের আইনে বাধে কি না। যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র ও-কর্ম গর্হিত বলেই গণ্য—ওকে নাকি খুন-খারাপি বলা হয়। আইনের এই ব্যবস্থা। অন্যায় ব্যবস্থা বলতে পারেন, কিন্তু আমরা তো আইন বানাইনি—কোনো আইন অমান্য আন্দোলনেও যোগদান করিনি এ পর্যন্ত।'

'কী সর্বনাশ।'

'তা যা খুশি বলুন। ফাঁসিকাষ্ঠে পা বাড়াতে পারব না। আমাদের এই শর্তে রাজী থাকেন তো, অর্ডার দিন, যত ডজন আপনার লেগ্‌স দরকার এই দণ্ডেই যোগাচ্ছি। বয়েজ—অ্যাডালটস্‌—অ্যাডালটারেটেড—যে রকমের লেগ্‌ চাই...'

'অ্যাডালটারেটেড...?'

'হ্যাঁ, ভ্যাজাল পা-ও পাওয়া যাবে বইকি! আজকাল আর কোন্‌ জিনিসের

ভ্যাজাল বেরোয়নি বলুন! পায়ের ভ্যাজাল, মানে, একখানা কিংবা দেড়খানা কাঠের পা—তাও আমরা সরবরাহ্ করতে পারব। তবে তা তেমন সুস্বাদু হবে কিনা সে বিষয়ে আমরা গ্যারান্টি দিতে অক্ষম।'

'হরিবল্!'

'দামের কথা বলছেন? তা দামটা এখন ঠিক বলতে পারছি না। আসল পা-র চেয়ে কেঠো পা-র দর বেশি পড়বে কিনা বলা কঠিন। যাক্, সে আপনি বিলের সময় টের পাবেন। তবে এটুকু বলতে পারি, ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের লেগ্সের দর একটু বেশি। বোধহয় আদর বেশি বলেই। গ্রোন আপ মেয়েলি পা-র আরো বেশি চাহিদা। আর দামটাও একটু—হে' হে'—একটু বেশি পড়বে বোধহয়।'

'এনাফ্! এনাফ্। খুব হয়েছে। আর আমি বেশি শুনতে প্রস্তুত নই। আপনার ওপরওলা কর্মচারী কেউ যদি থাকেন তো অনুগ্রহ করে তাঁকে একটু ডেকে দিন।'

'তাহলে ধরে থাকুন খানিক। খোদ মার্কেট সুপারিন্টেণ্ডেন্টকেই খবর পাঠাচ্ছি, তিনি অবিশ্যি আমার চেয়ে আরো ওয়াকিবহাল—অনেক কিছু খবর রাখেন।'

'তাহলে তাঁকেই ডেকে দিন দয়া করে। ধন্যবাদ—উঃ!'

রিসিভারটা রাখতেই বিক্রমের মুখ ফোটে—'ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের পায়ের দর বেশি কেন বাবা? কেন, ছেলেদের পা কি মাগনা?'

'মাগ না-ই তো। ছেলেরা কি কারো মাগ হয় নাকি? ছেলেদের কি কেউ বিয়ে করে কখনো? এমন কি, তোমাদের মগের মুল্লুকেও কেউ তা করে না নিশ্চয়? তুমি কাউকে দেখেছ কোনো ছেলেকে বিয়ে করতে?'

'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'বলো কি হে? আমি হতবাক হয়ে যাই—'কাকে দেখেছ শুনি?'

'কেন, আমার ছোট পিসিকে আর আমার ভাইঝিদের। তারা সবাই একেকটা ছেলেকে বিয়ে করেছে।'

'তুমি ভারী বোকা!' বলে আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করি—'মেয়েদের পা সামান্য নয়—এমন কি তারা তোমার মাগ না হলেও। তাকে বলে পদপল্লব—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সেই পা নিজের মাথায় ধরে ধন্য হতে চেয়েছিলেন—স্মরগরল-খণ্ডনম্ মম শিরসি মণ্ডনম্ দেহি পদপল্লবমুদারম্।'

'কিন্তু ছেলেদের পা কি একেবারেই কিছু না?' বিক্রম তথাপি নিজের গোঁ ছাড়ে না। ছেলেদের পক্ষ নিয়ে পরোক্ষে নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে চায় বুঝি।

এক নম্বরের গোঁয়ার!

'কিছু নয় কে বলেছে? তারও কিছু দাম আছে বই কি! তবে ছেলেদের পা-কে কেউ পদপল্লব বলে না। বলে যে ঠ্যাং!'

'ঠ্যাং!'

'হ্যাঁ। অপরকে ঠ্যাঙাবার জন্যেই তার যা প্রয়োজন। ছেলেরা কিক করতে ওস্তাদ—তা ফুটবলেই কি, আর অবাঞ্ছিত কোনো লোকেই বা কি!'

'কিন্তু ছেলেদের পা ঠ্যাং হতে যাবে কেন?' বিক্রম তবুও অবুঝ।

'ঠ্যাংঠেঙে বলে—আবার কিসের জন্যে!' আমি বলি, 'তোমার, ছেলেদের পা কি ওই মেয়েদের মতন সুন্দর?'

'কেন, ছেলেদের পা কি দেখতে ভালো হয় না? ছেলেদের কি সুন্দর হতে নেই?'

'কদাচিৎ। আর হলেও তখন তাদের শুধু হ্যাণ্ডসাম্ বলা যায়। কিন্তু মেয়েদেরকেই লেগসাম্ বলা হয়ে থাকে—তারা যেমন হ্যাণ্ডসাম্ তেমনি লেগসাম্। যাক এ নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। এর রহস্য বুঝতে তোমার এখনো ঢের দেরি আছে!...'

বলে ওকে বাতিল করে দিয়ে আমি বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়ি, এতক্ষণ ধরে টেলিফোনে গলাবাজি করে গলদঘর্ম হয়ে পড়েছিলাম, বের হয়ে সটান কফি হাউসে চলে যাই। আলুভাজা আর কফি খেয়ে তাজা হয়ে সেলুনে দাড়ি কামিয়ে চুলচর্যা সেরে তার পরে আরেক কাপ কফি খেয়ে দেড় ঘণ্টা বাদে বাড়ি ফিরি। তারপর......

ঢুকতেই বিক্রমের গলা পাই, 'বাবা, লোকটা এর মধ্যে পঞ্চাশবার হ্যালো হ্যালো করেছে...'

'দাঁড়াও, সাড়া দিচ্ছি।' বলে আমার শখের call কারখানায় যোগ দিই।...

'হ্যালো—হ্যালো—হ্যালো', বেশ কড়া গলায় হাঁক ছাড়ি এবার।

'ওঃ, হ্যালো,—আপনি সুপারিন্টেন্ডেন্ট? মাপ করবেন, আপনাকে বিরক্ত করতে হল। কষ্ট দেবার আগে মার্জনা চাইছি। দুঃখের বিষয়, আপনার বাজারের একজনও আমাকে ডিমের খবর দিতে পারল না।'

'ডিমের খবর? কেন, আজকের স্টেট্সম্যানেই তো আছে। আর স্টেট্স-ম্যানেই বা কেন—সব কাগজেই তো রয়েছে—প্রত্যহই বেরোয়। আজকালকার যা কিছু খবর সবই তো মশাই, ডিমের খবর। ঘোড়ার ডিমের খবর সব। যাক্, নমস্কার, আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভারী খুশি হলাম। নমস্কার—গুডইভনিং!'

ম্যাচের ইনটারভ্যালে ক্লান্তদেহে বিছানায় এসে লম্বা হয়ে পড়েছি। ভালো করে সটানও হইনি, আবার ফের ক্রিং ক্রিং ক্রিং। স্খলিত পায়ে টলতে টলতে গিয়ে রিসিভারের হাতে ধরা দিই। একটু আগে কড়া গলায় পার্ট হয়ে গেছে, এবার একটু মিঠে গলায় শুরু করা যাক। মৌমাছি-নিন্দিত মিহি সুরে আরম্ভ করলাম 'হ্যালো, কাকে চাই বলুন?'

'রাজশেখরবাবু কি বাড়ি আছেন?...আপনি-আপনি তাঁর কে?'

'আমি? আম তাঁর ভাগনি।'

কে রাজশেখরবাবু এবং কোন্ রাজশেখরবাবু যতক্ষণ না সম্যক বিদিত হচ্ছে ততক্ষণ তাঁর ভাগনি রূপেই বিরাজ করা যাক।

'ও! আপনি তাঁর ভাগনি? আপনি ভাগ্যবান্। আই মীন্—ভাগ্যবতী। আমি আপনার মামার যে কী দুর্দান্ত ভক্ত কী বলব মশাই। ওর লেখা দারুণ, ভালো লাগে আমার। কি করে লেখেন কে জানে, কিন্তু কি ভালই যে লেখেন!'

এতক্ষণে বুঝলাম, রাজশেখরবাবু ওরফে পরশুরাম। পরশুর থেকে আজকের রামে—অদ্যকার আরামে অনেকখানি তফাত। মাঝখানে গোটা গত-কল্যটাই বাদ। তবু নিজের সৌভাগ্যে যদ্দুর সম্ভব গদ গদ হয়ে জানাই, 'এ বিষয়ে আমরা একমত। যদিও আমাদের মামা, তবু আমরাও তাঁর কিছু কম ভক্ত নই। ডেকে দেব তাঁকে?'

'তাঁকে ডাকবেন? তাঁকে আর কেন ডাকবেন? তিনি কাজের লোক—তাঁর কাজের সময় নষ্ট করতে চাইনে। আমার—আমার তো কোনো কাজের কথা না, আমার হচ্ছে কথার কাজ। আপনি দয়া করে তাঁর কাছে থেকে জেনে আসতে পারেন?'

'কী জানতে হবে বলুন?'

'দেখুন, আমি একজন লেখক। লিখতে লিখতে একটা বানানে আমার আটকেছে। সেই বানানটা জানার জন্যই কলম ছেড়ে ফোনে হাত দিয়েছি।'

'কিসের বানান?' আমারও ফনায় হস্তক্ষেপ—কেউকেটা নয়, এক কেউটের—সাক্ষাৎ একজন লেখকের!

'জরি বানানটা কী, জানা দরকার। ব-য়ে শূন্য র, না ড-য়ে শূন্য ড়। আমার গল্পের নায়ক জড়িপার কাপড় পরেই মুশকিল করেছে। অবশ্যি, তাঁর কাপড় খুলে নেওয়া যায় না যে তা নয়—'

'না না। তা করবেন না। তাতে কাজ নেই। সেটা ভারী বিসদৃশ হবে। বস্ত্রহরণের নিয়ম—মানে, ছেলেদের বস্ত্রহরণের নিয়ম তো নেই, কিন্তু সে কথা থাক্! আমি এক্ষুনি জেনে আসছি—দাঁড়ান।' বাধা দিয়ে আমি জানাই।

'যদি তেমন অসুবিধা না হয় কাপড় খুলে হাফ-প্যাণ্ট পরিয়ে দেব না হয়, তার কী হয়েছে।'

'আচ্ছা, একটু ধরে থাকুন আপনি। এলাম বলে।'

ইতিমধ্যে পাশের বাড়ির একটি বালকের সাথে পাশ্চাত্ত্য সমরকৌশল নিয়ে মিনিট পনেরো কূটতার্কিক আলোচনা চালিয়ে—তার মতে, উক্ত রণনীতি সংক্ষেপে একটি সংস্কৃত কথার একান্ত অভিব্যক্তি ছাড়া কিছু নয়, 'যঃ পলায়তি স জীবতি' এই চলতি সংস্কৃতির পদাবলী সংস্করণ—ধাবমান পাদটীকা মাত্র। সাদা বাংলায়, রানিং ফুটনোট। এ বিষয়ে ওর বাগ্‌বিস্তারের যার-পর-নাই প্রতিবাদ করে ফের টেলিফোনের খপ্পরে ফিরে আসি। যথাসাধ্য রাজশেখরবাবুর মত গলদেশ করে হাঁকি—'হ্যালো!'

'ও। আপনি! রাজশেখরবাবু? আমার কী সৌভাগ্য!'

'হ্যাঁ, শুনুন বানানটা তো আমি অফ্‌হ্যান্ড্‌ বলতে পারছিনে। চলন্তিকা-খানাও আমার হাতের কাছে নেই এখন আবার। আপনি এক কাজ করুন বরং।'

'বলুন—বলুন!' ব্যগ্র স্বর।—'যা বলবেন করব।'

'যা খুশি একটা 'র' বসিয়ে যান। কখনো ব-য়ে শূন্য কখনো বা ড-য়ে শূন্য—যখন যেটা মর্জি বা যেখানা হাতের কাছে এসে যায় তাকে বসান।'

'কিন্তু তাতে কি ভুল হবে না? একটা তো ওদের ভুল নিশ্চয়ই?'

'ভুল তো বটেই। সেই জন্যেই ওদের ঘাড়ে, এক কাজ করুন, একটা করে চন্দ্রবিন্দু বসিয়ে দিন।'

'চন্দ্রবিন্দু কেন?' কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা।

'তাহলে অন্ততঃ অর্ধেক বাংলার ভোট তো আপনি পাবেন। সারা পূব বাংলার; ভুল হলেও তারা ভোট দেবে। আর ভোটারি থাকতে আপনার ভয় কি মশাই? বইয়ের কাটতি নিয়ে কথা, তা হলেই হল।'

'কিন্তু ও-ছাড়াও অনেকটা সমস্যা আছে যে। শাবাশ কথাটা তো সংস্কৃত নয় —ওটায় আমি তালব্য শ ব্যাভার করলে কি—'

'খুব দুর্ব্যবহার হবে। তার চেয়ে ওর স-স্থানে দু জায়গাতেই—ছ আদেশ করে দিন। তাহলে বাকী বাংলার—পাকিস্থানী আধখানার হাততালি আপনার একচেটে রইল। আর কী চাই?'

'ছাবাছ বলছেন?'

'হ্যাঁ, ছাবাছ। আচ্ছা, নমছকার। আছি তবে।'

অদৃশ্য লেখককে উৎসাহ দিয়ে, নিজের বিছানায় ফেরত এসে—একেবারে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু কপালে কল-ঙ্ক থাকলে রেহাই কোথায়? কলিযুগ খতম হয়ে এখন কলের যুগ, এবং টেলিফোনের কলেই তার যত কার্কলি! কাজেই একটু বাদেই আবার সেই কলকলোচ্ছ্বাস।

এবার চৌকিটাকে টেলিফোন রিসিভারের কাছে টেনে নিয়ে আসি। তারপর শুয়ে শুয়েই সেই কলধ্বনিতে কান দিই।

'এটা কি বুকিং অফিস?' এবার ওধার থেকেই বাণীনিন্দিত আওয়াজ পাওয়া যায়। আমাকে শশব্যস্তে পাশ ফিরতে হয়।

'কিসের বুকিং?'

'রঙমহল থিয়েটার কি এটা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—ঠিক ধরেছেন।' অম্লানবদনে ধরা দি।

'আসছে রবিবার ম্যাটিনীর দুটো সীট দিতে পারেন আমায়?'

'পারি বই কি। একটু দাঁড়ান, প্ল্যান্‌টা দেখে নিয়ে বলি।...হ্যাঁ, পারি। একটা সীট হবে গ-বর্গে; স্টেজ থেকে থার্ড রো-রে, বুঝেছেন? সেখান থেকে স্টেজের দৃশ্য অতি সুচারু।

'আরেকটা সীট পাবেন আর একটু পিছনে। একেবারে থ-বর্গে। সেখান থেকে স্টেজের ঘটনা একটু সুদূরপরাহত মনে হলেও কিছু কম উপভোগ্য

নয়। সুদৃশ্যই বলা চলে, তবে সুশ্রাব্য কিছু হবে কি না তা বলতে পারি না।'

'দুটো পাশের সীট হয় না?'

'পাসের সীট? না, পাস আজকাল বিলকুল বন্ধ।'

'না না, পাসের কথা বলছিনে। দুটো সীট পাশাপাশি হয় কি না, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।'

'পাশাপাশি সীট চাচ্ছেন কেন জানতে পারি?'

কিছুক্ষণ কোনো সাড়া নেই। মেয়েটি যেন থ-বর্গে গিয়ে পড়েছে মনে হয়। একটু পরে আমতা আমতা করে বলে, 'আমরা দু'জন যাবো কিনা, দুই বন্ধুতে।'

'নিশ্চয় কোনো পুরুষ বন্ধু, অনুমান করি?' আমার পুরুষ কণ্ঠ।

আবার চুপচাপ। ধাক্কাটা সামলে মেয়েটি অর্ধস্ফুট স্বরে বলে, 'এখনো পুরোপুরি স্বামী হন নি বলেই বন্ধু বলেছি। নইলে—নইলে—' বলতে বলতে সে থেমে যায়।

'নইলে স্বামিত্বে ওঁর কোনো কসুর নেই।—এই তো বলতে চাইছেন?' আমার বলা।

মেয়েটি নীরব।

'যাক্ গে, সে বিষয়ে আমাদের মাথা ঘামিয়ে লাভ? উনি স্বামীর যূপ-কাষ্ঠে যাবেন, কি, শেষে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবেন—তাতে আমাদের কি? তা আমাদের দেখবার নয়, কিন্তু এরকম ক্ষেত্রে পাশাপাশি সীট দিতে আমরা অক্ষম। কেননা, সুনীতি বজায়ের দিকটাও আমাদের দেখতে হবে তো। থিয়েটার খুলেছি তো কী! সমাজের প্রতি কোনো দায়িত্ব নেই আমাদের? ওধারে আবার সুনীতি সঞ্চারিণী সভা আছেন, শনিবারের চিঠি রয়েছেন—তাঁদের অমান্য করা যায় না।'

'কিন্তু ধরুন, থ বর্গে আমার সীটের পাশে', মেয়েটি বলতে গিয়ে ফের থতমত খায়।

'হ্যাঁ, দু পাশেই দু'জন পুরুষ পাবেন। কিন্তু তাঁরা আপনার অচেনা পুরুষ। একেবারে আন্‌কোরা পরপুরুষ? তবে তাঁরা ভদ্রলোক নাও হতে পারেন।'

'তাহলে?—'' মেয়েটি তার বক্তব্যকে যেন বিশদ করতে পারে না।

'কেন দেখতে আসছেন। আড়ালে বলি আপনাকে, যাস্‌সেতাই বই। নোংরা ব্যাপার। পচা সব সিনারি। অনর্থক পয়সা নষ্ট আর সময়ের বাজে খরচ। বাসী বিলিতী নাটকের অতিশয় বাজে নকল—আর অভিনয় এত রাবিশ, যে বলা যায় না। তার সঙ্গে সীট-ভর্তি ছারপোকা। তার ওপরে পানবিড়ি-ওয়ালার চীৎকার। অবিশ্যি, ক্ষতিপূরণস্বরূপ মাঝে মাঝে এক আধটু নাচগান আছে বটে, কিন্তু তাও আবার অতি আধুনিক মারপ্যাঁচের—অর্থাৎ নাকিকান্নার সঙ্গে তুড়িলাফ। মানে হয় না, রাগ হয়। মোটেই সুবিধের নয়। তবে কিনা এ

সমস্তই কিস্তিবন্দী হারে—একটানা অসহ্যতা না—কিন্তু ছারপোকাটা আগা-গোড়া। তার চেয়ে রবিবারের দুপুরটা আরাম করে বাড়িতে শুয়ে ঘুম লাগান—কিংবা পাড়াপড়শীর সঙ্গে কোঁদল করে কাটিয়ে দিন, ঢের সার্থক হবে।'

শুয়ে শুয়ে হাত বাড়িয়ে রিসিভার-রক্ষার অপচেষ্টায় চৌকি থেকে গড়িয়ে পড়তে পড়তে কোনরকমে বেঁচেছি। আধ ঘণ্টাও বাদ যায় নি, আবার সেই করাল কলকল—নিনাদ। শুয়ে শুয়ে হাত বাড়াই—

ওধার থেকে আওয়াজ আসে, 'হ্যালো!' এধারে বিছানায় শুয়ে হেলাভরে শুনতে গেলে যা হয় তার চূড়ান্ত করে জানাই : 'হ্যাঁ, হেলেছি। বলো। বলে ফ্যালো।'

'হ্যালো। দেবতোষ? তুমি?'

'দেবতোষবাবু পাশের ঘরে। ধরে থাকুন, তাঁকে ডেকে আনছি। কে ডাকছেন বলবো?'

'কিছু বলতে হবে না। শুধু বললেই হবে।'

'আপনি কে বলুন?'

'কী পাপ! বলোগে হরিহর।'

'হ্যালো—হরিহর, কী খবর?'

'উঃ, এত দেরি। পাশের ঘর থেকে পেঁছতে বুড়িয়ে গেলে যে হে! শোনো—বোর্ডের মিটিংয়ের কথাই বলছি। ব্যালেন্স শীট্ সব তৈরী তো?'

'সেই কর্মেই তো এতক্ষণ ধরে লিপ্ত ছিলাম হে!—'

'ও! ভালো! শোনো। দেবেনের সাথে আমার কথা হয়েছে। মিলের শেয়ারগুলো এই বেলা আমরা ঝেড়ে ফেলতে পারি। এরপর যত চটপট পারা যায় লালবাতি জ্বালাতে হবে। কোম্পানীকে লিকুইডেশনে দিয়ে তারপরে আমাদের অন্য কাজ।'

'পাজি! বদমাশ কোথাকার!'

'কী বললে?'

'কই, আমি তো কিছু বলিনি।--বোধহয় আর কেউ আমাদের লাইনে জড়িয়ে পড়েছে।—(একদম হতচ্ছাড়া গলায়) এই উল্লুক!—মিয়াও!—ম্যাও।'

'মশাই, শুনছেন? লাইনটা ছেড়ে দেবেন দয়া করে?—এটা বেড়াল ডাকবার জায়গা নয়! হ্যালো! হ্যালো!—যাক্ আপদটা গেছে। ভালো কথা, শোনো, ভুলো না যেন।...হ্যাঁ, কাল রাত্রে এলে না কেন হে? আমার নতুন আলাপিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতাম।'

'কোন্‌টি বল তো?'

'আমার নতুন বান্ধবী। একে তুমি দেখোনি এর আগে,—কুমারী মঞ্জু সেন। আন্‌কোরা প্ল্যাক্‌সো কোম্পানি।'

'লিকুইডেশনে দিয়েছ, না দাওনি এখনো?'

'অ্যাঁ, কী বলছ?'

'তোমার মতে, কোম্পানি মাত্রই তো লিকুইডেট করার জন্যে—তাই না?'

'মঞ্জু সেন তেমন নরম মাটি নন। অত সহজে গলবার নয়। গলবার না।'

'কোন মঞ্জু সেন বলো তো? ঐ নামের একজনের সাথে ছেলেবেলায় আমার—না, বলব না। ইস্কুলে পড়বার সময় ব্যাকরণ মঞ্জুষার সঙ্গে এক মঞ্জু সেনকে মুখস্থ করেছি। সে-ই কী? সে-ই বোধহয়, নাঃ, সেকথা বলে কাজ নেই। আনটাচ্ড প্ল্যাক্সো তো। সেসব শুনলে তুমি ক্ষেপে যেতে পারো। সব কথা সবাইকে বলতে নেই। একা মঞ্জু সেনই একজনকে ইনসেন করতে যথেষ্ট!— আচ্ছা মিটিংয়ে তো দেখা হচ্ছে আবার, এখন গুডবাই।—'

একটু বিশ্রাম নিতে না নিতেই আবার টেলিফোন-ঝঙ্কার।

'হ্যালো!'

'চীফ মিনিস্টারের বাড়ি?' একেবারে বাজখাঁই গলা এবার। উত্তর দিতে, দম নিতে হয়।

'চীফ মিনিস্টারের বাড়ি কি?' অপর ব্যক্তির পুনরুক্তি।

'হ্যাঁ, ঝাউতলা হাউস। বলুন।' আমি বলি।

"আমি হক্ সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।' নইলে এখুনিই পৃথিবীর চরম সর্বনাশ আসন্ন এমনি যেন ওর ভাবখানা।

'প্রাইভেট সেক্রেটারী এখন একটু ব্যস্ত আছেন। তাঁর আরদালীকে ডেকে দেব?'

'আরদালীকে আমার দরকার নেই। ইয়ার্কি পেয়েছ, ঠাট্টা হচ্ছে?'

'এক মিনিট।'

অনেক অনেক মুহূর্ত চলে যায়। এর মধ্যে আমি এ-ঘরে ও-ঘরে কয়েক চক্কর ঘুরে আসি। এতক্ষণ ধরে আনাড়ীদের পাল্লায় পড়ে খিদেয় নাড়ি চন্ চন্ করছিল, এই সুযোগে কিছু মাখন-বিস্কুট আর পাঁউরুটি-জেলির শ্রাদ্ধ করে সবল হয়ে নি। তারপরে নবোদ্যমে ফিরে এসে ফের আবার স্বল্পযুদ্ধে যোগ দিই।

'হ্যালো—হ্যালো—'

'হ্যালো! কাকে চাই?'

'হাউস সুপারিন্টেন্ডেন্টকে ডেকে দাও—এক্ষুনি—'

'সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্বয়ং কথা বলছেন—'

'শুনুন—আমি একজন এম-এল-এ। আধঘন্টা ধরে আমি—'

'দয়া করে অত চেঁচাবেন না। কিছু শুনতে পাচ্ছি নে।...হ্যাঁ, কী বলছ তোমরা বলো ত? শাখাওয়াৎ স্কুলের মেয়েদের পক্ষ থেকে চীফ মিনিস্টারকে বরণ করতে চাও?'

'হ্যালো—! আমি একজন—'

'অত হ্যালো হ্যালো করবেন না। পাশের লোকের কথা শোনা যাচ্ছে না। —হ্যাঁ, কি বলছিলে? বরণ করার কথা হচ্ছিল, তাই না? কিন্তু ওটা কি

সংবরণ করা যায় না? চীফ মিনিস্টারকে কি না নিয়ে গেলেই নয়?...নিয়ে যাও, কিন্তু দেখো যেন কোনো মিসচীফ না ঘটে! অনারেবল হক্ সাহেব নতুন আর কোনো কুমারীর পাণিগ্রহণ করতে অক্ষম। যে ক'টির বর আছেন তাই তাঁর যথেষ্ট, তার চেয়ে আর বেশী রমণীয় হতে তিনি নারাজ। হক্ সাহেবের প্রতি যেন নাহক্ কোনো জবরদস্তি না হয়।'

'কি—হচ্ছে কী? কান দিচ্ছেন এধারে? আমি একজন বেঙ্গল অ্যাসেম্‌ব্লির মেম্বার—এক ঘণ্টা ধরে গলা ফাটাচ্চি—'

'কোনো মিসচীফ হবে না বলছ তোমরা? হ্যাঁ, মিসচীফ্ বাঁচিয়ে। আমরাও সেটা চাইনে। এই চীফ-কে সামলাতেই আমাদের প্রাণান্ত, এর পর আর একজন চীফ জুটলে...'

'বলি, হচ্ছেটা কী? হকসাহেবকে বলে তোমার পিণ্ডি চটকাচ্ছি, দাঁড়াও!'

'শুনে দুঃখিত হলাম। বলুন, কী বলতে চান—বলে ফেলুন চট করে।'

'কিছু বলতে চাই না আপনাকে। আপনার মত উজবুককে কিছু আমার বলার নেই। তার কোনো প্রয়োজনও করে না। চীফ মিনিস্টারের প্রাইভেট সেক্রেটারীকে আমি টেলিফোনে পেতে চাই।'

'সেক্রেটারীদের মধ্যে কোন্‌টিকে আপনি চান?'

'হ্যালো। আমি খোয়াজা সার নাজিমুদ্দিনের বাড়ি থেকে বলছি—

'কে খোয়া গেছে বললেন?'

'খোয়া নয়—খোয়াজা। সাদা বাংলায় খাজা।'

'খাজা। বটে। আমি খাজা? বটে বটে! খাজা বলে আমাকে গাল দিচ্ছেন? কিন্তু আমায় গালাগাল দেবার আপনি কে? কী আপনার অধিকার—শুনি একবার?'

'আহা, আপনি কেন খাজা হবেন? খাজা হতে যাবেন কেন? আপনাকে আমি খাজা বলিনি।'

'তবে কাকে বলেছেন জানতে পারি?'

'যিনি খাজা তাকেই বলেছি। খাজা সার—'

'স্পষ্ট করে বলুন।'

'সার নাজিমুদ্দিন।'

'বানান করুন। বোঝা যাচ্ছে না ঠিক।'

'N-A-Z-I-M-U-D-D-I-N'

'ও। আমাদের খাজা স্যার নাৎসিমুদ্দিন! তাই বলুন।'

'নাৎসি। নাৎসি কেন? নাৎসি কেন বলছেন? উনি কি নাৎসি?'

'নতুন বানানে—আবার কেন? এন-এ-জেড-আই উচ্চারণ কী হয়? বাংলা খবরের কাগজ পড়েন না কখনো? হিটলারী বাহিনীদের কী বলে ডাকা হয়ে থাকে? তা, তিনি কখন খোয়া গেছেন বললেন? খুব সর্বনেশে কথা তো! পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে?'

'তিনি খোয়া যান নি, তাঁর কোনো কথাও না। তাঁর বাড়ি থেকে আমি কথা বলছি।'

'কী ভয়ংকর লোক মশাই আপনি। সামান্য একটা দুয়ানি বাঁচানোর জন্যে—তুচ্ছ কয়েক পয়সার খাতিরে—অমনি টেলিফোন করার সুবিধা নিতে অন্দর অবধি গেছেন? কী সর্বনেশে লোক আপনি! ইস্!'

'কোথাকার বেল্লিক। জানো, তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ জানো? খান বাহাদুর খোদ আবুবকর সাহেবের সঙ্গে কথা কইছ জানো? তোমার বেয়াদবির জন্যে অ্যাসেম্‌ব্লিতে অ্যাড্‌জর্নমেণ্ট মোশন আনতে পারি তা জানো? তুমি হক্ সাহেবের বাড়ির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হও আর যাই হও।'

'আপনি যে আসল অকৃত্রিম আবুবকর তা অনেক আগেই টের পেয়েছি জনাব। এতক্ষণের আপনার বকর বকর থেকেই!'

'ইয়া আল্লা। (মিনিট দুই চুপচাপ—তার পর ধাক্কা সামলে)। হ্যালো... কে তুমি?...যদি হক্ সাহেবের হাউস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হও, তোমার সঙ্গে আমি আর কোন কথা কইতে চাই না।'

'আজ্ঞে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে এইমাত্র কর্তা ডাক দিলেন। রিসিভার রেখে এই তো ওপরে গেছেন। ডেকে দেবো?'

'না না একদম না। চট করে যদি পারো এই ফাঁকে চীফ মিনিস্টারের প্রাইভেট সেক্রেটারীকে খবর দাও। বলো যে খাঁ বাহাদুর আবুবকর সাহেব—,

'আর বলতে হবে না। আপনি কি চীফ প্রাইভেট সেক্রেটারীকে চান? না অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রাইভেট সেক্রেটারীকে? না ডেপুটি চীফ সেক্রেটারীকে আপনার দরকার? নাকি, সাব ডেপুটি চীফকে চাইছেন? কিংবা সাব অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সাব ডেপুটি চীফ সেক্রেটারীকে ডেকে দেব? সব সুদ্ধ আমরা ছত্রিশ জন সেক্রেটারি রয়েছি—পরস্পরের মধ্যে আমাদের বহুৎ পার্থক্য বুঝতেই পারছেন।'

'আপনি—আপনি কে? কোন্ সেক্রেটারী?'

'সেক্রেটারীর দিক দিয়ে কিছু না। তবে বি-সি-এস-এর—বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের দিক থেকে আমিও একজন বইকি! আমাকে সাব অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সাব ডেপুটি বলা যেতে পারে। আমি হক সাহেবের সদর দরজার হেড কনস্টেবল।'

'আপনার দ্বারা—আই মীন্—তোমার দ্বারা হলেও হয়তো হতে পারে। তুমি হয়তো এটা পারতে পারো। ব্যাপার এই—'

'একমিনিট! এই যে চীফ মিনিস্টার নিজেই এদিকে আসছেন। আপনি তাঁর সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছুক কি? কোনো আপত্তি নেই? তাহলে তাঁকে বলুন। সত্যি বলতে, আমি এখন একটু ব্যস্তই আছি।'

'নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই।...হ্যালো।'

'হ্যালো।...আমি চীফ মিনিস্টার...হ্যাঁ...ও। আবুবকর!...তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে ভাই মিনিট খানেক সবুর করবে? ততক্ষণ আমি আমার সেক্রেটারীর সঙ্গে কথাটা আগে সেরে ফেলি।'

(একেবারে গলে গিয়ে) 'নিশ্চয়...নিশ্চয়। কোনো তাড়া নেই...তেমন তাড়া নেই আমার...যতক্ষণ লাগে আপনি সারুন...'

তদবস্থায় তাকে ত্যাগ করে আমি বিছানায় ফিরে আসি। খাঁ বাহাদুরের তরফ থেকে যে টেলিফোনের আর কোনো তাড়না আসবে না তা স্থির। তিনি নিজেই নিশ্চয় করে জানিয়েছেন তাঁর কোনো তাড়া নেই—টেলিফোনে কান দিয়ে তটস্থ থাকবেন। ঐভাবে অনন্তকাল ধরে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কথামৃতের অপেক্ষা করলেও আমি অবাক হব না।

বিছানা আমার অভাবে খাঁ খাঁ করছিল। কিন্তু শুতে না শুতেই ফের কলোচ্ছ্বাস। আবার কান খাড়া করে দাঁড়াতে হলো। নাঃ, আবুবকর না, হরি-হরও নয়, একেবারে আলাদা খাঁড়া। তবে হ্যাঁ, কল দেবার মত গলা বটে, এমন কি, শোনবার মতও বলা যায়।

হ্যাঁ, কলকণ্ঠ যদি বলতে হয় তো একেই।

মধুক্ষরা মেয়েলী গলাই বলে।—'হ্যালো, মেঘেন বাবু—' কলকণ্ঠী মেঘেন ভ্রমে আমাকে সম্বোধন করেন।

'কে আপনি? কোথ্থেকে বলছেন?'

আমিও মেয়েলী গলা বার করি একখানা। ওর বীণা-বিনিন্দিতর জবাবে আমার বিনি-বিনিন্দিত সুর।

'তুমি? তুমি কে?' মেয়েটির স্বর বিস্ময়ে ভেঙে পড়ে—আমার উপকূলেই এসে ভাঙে।

মেঘেনবাবুর কোনো বোন টোন ছিল বলে শুনিনি তো। কী রকম বোন?'

মধুঝরা গলা চাখতে না চাখতেই হুলভরা হয়ে ওঠে।

'বোন আবার কি রকম হয়? ক'রকম হয় শুনি? বোনের ফের রকমফের আছে নাকি?' আমি জানতে চাই।

'মানে, মেঘেনবাবুর তুমি কেমন বোন? তার সঙ্গে তোমার কি রক্তের সম্বন্ধ? নাকি—' না-টা যে কী তা সে ভাষায় কুলিয়ে উঠতে পারে না।

'রক্তের সম্বন্ধ কি মাংসের সম্বন্ধ তা তুমি মেঘেনবাবুকেই জিজ্ঞেস কোর না হয়। আমি তো জানি বোনের সঙ্গে হচ্ছে অস্থির সম্বন্ধ। এই আছে এই নেই—সম্বন্ধ আছে কি না তাই টের পাওয়া দায়। সর্বদাই অস্থির। শ্বশুরবাড়ি একবার গেলেই হল।'

'তা বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর জন্যেই তো বোন। বোন নিয়ে কি কেউ বাস করে নাকি?'

'অন্ততঃ নিজের বোন নিয়ে তো নয়। বনবাসী হতে হলে—হ্যাঁ, কিন্তু সেসব ক্ষেত্রেও আমার তো মনে হয়, বোনের কোন অস্তিত্বই নেই—অস্থিত্বই সার। বোনের সবটাই হার—হার বা হাড় যা বলো। সেখানে জেতার কোনো কথাই নেইকো। সেইজন্যেই বলছিলাম ব-য়ে ও-কার ন বোন, বা বি-ও-এন-ই বোন একই কথা—বোন সর্বদাই অস্থি-র, কেন না, কখনই সেই বোন, একজনের

নয়—অনেকেরই, যাকে বলে 'বোন্ অফ কন্‌টেন্‌শন্'। অবশ্যি, আমি মেঘেন বাবুর সে রকম বোন কিনা তা আমি বলতে চাই না।'

'বুঝেছি, আর বলতে হবে না—' মেয়েটির গলা মেঘলা হয়ে আসে—গুরু গরজীন শোনা যায় এবারঃ 'মেঘেনবাবুকে বলে দিও, একজন ফোন করেছিলো সে আর ফোন করবে না।'

'আহা চটছ কেন ভাই। রাগ করে কি? ছি। আমি মেঘেনবাবুর সে রকমের বোন নই।' আমি চাটুবাক্যে চটপট সন্দেহ-ভঞ্জনের চেষ্টা করি—ওর এই উচাটন দূর করতে চাই।

'মেঘেনবাবুর মা-র পেটের কোনো বোন্ কখনো ছিল বলে জানতুম না তো।' ঘুরে ফিরে ওর মুখে সেই এক কথা। 'তুমি কি ওঁর মামাতো বোন?'

'না। মামাতো বোন নই, মাসতুতো বোন নই, পিসতুত বোন নই, কিস্‌তুতো বোনও না—'

'কিসের কথা বললে?'

"কিসের কথাই বললাম তো। কে-আই-ডবল-এস্—কিন্তু সে সম্পর্কও মেঘেন বাবুর সংগে নয় আমার।'

'মাগো, কী কথার ছিরি!'

'পাড়াটে বোন নয়, ভাড়াটে বোনও না—এমন কি, 'নিজের চেয়ে পর ভালো পরের চেয়ে বোন ভালো'—বলে যে বনের এত অপরিমিত প্রশংসা, শোনা যায় পল্লীর মত পরের সে বোনও আমি নই।'

'কি বললে? পরের বোন! পরের বোনের চেয়ে ভালো—হ্যাংলা ছেলেদের কাছে আর কী আছে।' সে বলে।

'তা বটে। দূরের মাঠ যেমন আরো সবুজ, পরের বোন তেমনি আরো মধুর।' —বনানীয় গভীরতায় আমার অনুপ্রবেশ।

'তুমি কি মেঘেনবাবুর সেই রকমের বোন নাকি?'

'পরস্মৈপদী বন বলছ? না, তা নয়। সে-রকম বোন খুব বেশি দিন পর থাকে না—বোন ধুয়ে গিয়ে ক্রমেই বন্ধু হয়ে পড়ে—শেষে, উপসংহারে, Fool-শয্যায় ফেলে পরাস্ত করে দ্যায়। না, আমি কারো তেমন বোন নই—এবং হতেও চাইনে। তবে আমি মেঘেনবাবুর ঠিক মায়ের পেটের বোন না হলেও তাঁকে আমার সহোদর বলতে বাধা নেই। অভিন্নহৃদয় বলে একটা কথা শুনেছ তো। তেমনি আমার অভিন্ন-উদর।'

'হয়েছে, হয়েছে, দয়া করে একটু মেঘেনবাবুকে ডেকে দেবে—বলবে যে, রুনু ডাকছে।' তারের এপারে থেকেও যেন তার স্বস্তির নিশ্বাস শুনতে পাই। এতক্ষণ পরে।

'সেকথা বললেই হয়। ফুরিয়ে যায়। তা না, কী বোন, কার বোন, কেন বোন—এই সব বোনের কান্না—এত অরণ্যে রোদন কেন রে বাপু!' এই বলে আমি নব মেঘদূত হয়ে মেঘেনবাবুর অন্বেষণে বেরোই—এক call পান্ত পার

হয়ে। মেঘেনবাবুর কিন্তু মুহূর্তও বিলম্ব হয় না—খবর দিতে না দিতেই তিনি হাজির। রনু-কুলের প্রতি তিনি যে স্বভাবতই অনুকূল সেটা বেশ বোঝা যায়।—'হ্যালো!'

'আমি রনু। রঙমহলে ফোন করেছিলাম। ম্যাটিনী শো-র দুটো পাশাপাশি সীট কিন্তু পাওয়া গেল না—'

'তা রবিবার না হয়, অন্যদিন হবে। রাত্তিরের শো-য় গেলেই বা ক্ষতি কি?'

'না। রাত্তিরে হয় না। তাছাড়া, আর হবেই না। কোনদিনই হবে না বোধহয়। সুনীতি চাটুজ্যের কী একটি সভা ভারী গোল বাধিয়েছে। পাশা-পাশি সীট ফর এভার দুর্লভ। তাই অন্য কোনো থিয়েটারেও আর খোঁজ নিইনি। তা হলে কী হবে বলুন তো?'

'সিট বুকিং-এ খুঁজেছিলে?'

'কোথায়? কোথায় বললেন?'

রেলওয়ে বুকিং অফিসে। বোম্বে মেল, ম্যাড্রাস্ মেল, তুফান মেল ইত্যাদিতে হয়তো পাশাপাশি সীট পাওয়া যেত।'

'মেঘেনবাবু, আপনি—আপনি কি—?' রনু যে আকাশ থেকে পড়ছে তার অনুরণন থেকেই বোঝা যায়।—'কী বলছ তুমি? সত্যি বলছ? মেঘেন, আমরা কি—ইলোপ করব আমরা?'

'আপনি' থেকেই এক ঝটকায় সম্পর্কটা আপনা-আপনির মধ্যে এসে দাঁড়ায়।

'ইলোপ হয়তো বলা যায়, কিন্তু বিলোপ নয়। মানে কিনা—কি বলে গিয়ে—এই ইয়ে অবধি আমরা এগুব—কিন্তু বিয়ে নয়।'

'তার মানে?'

'অচিন্ত্যর 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' পড়েছ নিশ্চয়—সেইরকম অচিন্ত্যনীয় কিছু একটা করলে কেমন হয়?'

'আচ্ছা—সে তখন দেখা যাবে। গাড়িতে একবার চাপা যাক তো—তখনকার কথা তখন। আচ্ছা, তাহলে তাই ঠিক রইলো। একটু দাঁড়াও—টাইম টেবলটা দেখে বলে দিই তোমায়।—রবিবার হাওড়ায় সন্ধ্যে সাতটায় পাঁচ নম্বর প্ল্যাট-ফর্ম থেকে যে গাড়ি ছাড়বে তার প্রথম ফার্স্ট ক্লাসের কামরায় আমি অপেক্ষা করব। কিন্তু জানালা দিয়ে মুখ বাড়াতে পারব না। যদি চেনা লোকের চোখে পড়ে যাই। তুমি সোজা এসে কামরায় ঢুকে পড়ো। দুটো টিকিট কেটে রাখব—সুদূর কোনো স্টেশনের। গাড়িটা হচ্ছে ম্যাড্রাস মেল—সেতুবন্ধ পর্যন্ত যাওয়া যায়। সে যাক্, কোথায় যাচ্ছি তা গাড়িতে উঠেই জানতে পাবে। তুমি উঠবে গাড়ির গোড়ার থেকে প্রথম ফার্স্ট ক্লাস কামরা যেটা সেইটের, মনে থাকবে তো?'

'ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট—এই তো? এ আর মনে থাকবে না? বেশ, আমিও তাহলে গাড়ি ছাড়বার ঠিক আধ সেকেণ্ড আগেই উঠবো—।'

'বলি হ্যাঁগা, কার সঙ্গে এত কথা কইছ এমন করে?' কল্পনা পাশে এসে দাঁড়ায়।—'কী এত কথা বাপু তখন থেকে?'

'এই—এমনি একটু ব্যাক্যালাপ করছিলাম আর কি।' রিসিভার রেখে আমি বলি।

'কার সঙ্গে এত কথা গো?' ও জিজ্ঞেস করে।

'যার তার সঙ্গে—কিছু কি ঠিক-ঠিকানা আছে। আর একজন কী? সকাল থেকে খালি রং নম্বরে ছিলাম। নিখরচায় একটু মজা করে নেওয়া গেল।'

'ও!' কল্পনা একটু মুখ টিপে হাসে মাত্র।

কলকলধ্বনি থামার সাথেই আমার বুক গুর গুর করে। ট্রেনের চাকার আওয়াজ শুনি—বুকের ওপর দিয়ে লাইন চলে গেছে—আমারই বুকের ওপর দিয়ে। চলেছে সেতুবন্ধের দিকে—সেই mad-rush mail. ঘটাং ঘট্ ঘটাং ঘট্—ঘট ঘটাং—আসন্ন মেলনের—মেল দুর্ঘটনার ইঙ্গিত বয়ে ঘনঘটা করে চলেছে গাড়িটা।

তার চাকার ঘট্টিকাব্য থেকে দেখতে দেখতে আরেক সুর বেরিয়ে আসেঃ 'রেলের ভ্রমণ কি আপনার এতই জরুরী—।' এবম্প্রকার শুনতে পাই। যুদ্ধ-বার্তাবহ সামরিক বিজ্ঞাপন, রেলের চাকায় ভাষান্তরিত হয়ে আমার অন্তরে সাড়া জাগায়।

না, এমন কিছু জরুরী নয়, জরু-র এমন কোনো প্রয়োজন আমার নেই। কল্পনাই রয়েছে, ইহকালের ক'টা দিন কল্পনার দ্বারাই কাটানো যায়। অন্য কোনো দারার প্রয়োজন নাস্তি।

রেলের ভ্রমণ। না, কী এমন জরুরী। নিজের ভেতর থেকেই তার জবাব পাই ঃ জরু-র তো এমনকিছু প্রয়োজন আমার নেই। বাড়তি জরু, মানে, জরু-র বহুবচনে আরো স্ত্রী-বৃদ্ধিতে প্রিয়জনতা কি কিছুমাত্র বাড়ে? গোদের উপর বিষফোড়া হলে কি আরো বেশী আরাম? আমার অভিজ্ঞতায় তার কোন সায় পাই না।

যুদ্ধের রক্তপতাকাটা শুধু সীমান্তেই উড়ছে না, নারীর সীমন্তেই নয় কেবল, দেশবিদেশ, ঘর-বার, আত্ম-পর নির্বিভেদে যুদ্ধভূমি। দশদিক থেকে অফুরন্ত আক্রমণ—নিস্তার কোথায়?

বার্থ কন্ট্রোল করেই যে বাঁচা যাবে তার যো কি? কিছুটা অন্তত রেহাই পাবো ভেবেছিলাম আমি। কিন্তু পেলাম কি? যার বার্থ রিজার্ভ করা আছে সে আসবেই—এক পথে না হলে অন্য পথে—বার্থরাইট কারো কিছু যাবার নয়। নিজের বিক্রমেই এসে উপস্থিত হবে। উপায় কি? মোর স্টোপস্‌কে এ নিয়ে বকতে যাওয়া বৃথা, শিশু ভোলানাথের হচ্ছে মোরি স্টেপ্‌স্। কোথায় কিভাবে কখন তাঁর পদক্ষেপ হবে কেউ তা বলতে পারে না।

বিক্রম ক্রমে ক্রমে আধুনিক নৃত্যকলার ন্যায় পরিস্ফুট হতে লাগল। কল্পনার রণাঙ্গনে গিয়ে হানা দিল পর্যন্ত।

কি রাঁধছ মা?'

'মাছের ঝোল।'

'ভারী গন্ধ ছাড়ছে।'

কল্পনা কি কাজে রান্নাঘর থেকে একটু নড়তেই সে নিজে খুন্তি নিয়ে তৎপর হয়েছে। একগাদা তেজপাতা, আধকৌটো জমানো দুধ আর গুচ্ছের উচ্ছে ছেড়ে দিয়েছে ঝোলের মধ্যে। কল্পনা ফিরে আসতেই সগর্বে জানিয়েছে—'এখন আর ছাড়ছে না।'

ওর পোষ্যপুত্রত্বে আমি কিন্তু ভারী কাহিল বোধ করছিলাম। প্রতিবেশী অনুকূলবাবুর ঘাড়ে ওকে গছানো যায় কি না বাজিয়ে দেখলে হয়। বললাম গিয়ে একদিন, 'এত বড়ো একটা মন্বন্তর গেল কারুক্কে একদিন একবেলা খাওয়ালে না। এ রকম সুযোগ জীবনে আর আসবে? একাধারে পুণ্যার্জনের আর নামার্জনের? সেই সঙ্গে চাল মেরে অর্থার্জনের কথাটা না হয় নাই ধরলাম। সরকারী চাল আর বেসরকারী ভাঁড়ার সবার ভাগ্যে তো সব সময় জোটে না ভাই। যাই হোক এখন একজন ইভ্যাকুয়ীর ভরণপোষণের ভারটা নাও অন্তত।'

'নিয়েছি তো। দুজন দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের নিয়মিত ভরণপোষণের ভার নিয়েছি।'

'অ্যাঁ।' শুনে আমি হাঁ হয়ে যাই।—'বলো কি হে?'

'হ্যাঁ। আমি আর আমার বৌ'। এই বলে আমার নাকের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে চলে গেল সে। অনুকূলের কাছ থেকে আনুকূল্য কোনদিন পাইনি সেকথা ঠিক, কিন্তু এতখানি প্রতিকূলতাও কখনও ওর কাছে আমার প্রত্যাশা ছিল না।

কিন্তু অনুকূলই ওদের পরিবারের শেষ কথা নয়—ওর পরিবার আছে; ক'দিন পরে কোথ্‌থেকে তিনি একটি আধা আসামী আধা বাঙালী মেয়ে কুড়িয়ে এনেছেন দেখা গেল। ঝি রাখবারই মতলব ছিল তাঁর গোড়ায়, কিন্তু আমাদের মহাজনী পদাঙ্ক অনুসরণ করে পোষ্যপুত্রী নেয়াই ঠিক করেছেন। ওরকম গালভরা নাম দিলে ঝিকে আর বেতন দেওয়ার দরকার করে না। টাকাও বাঁচে, যৈন ধর্মও রক্ষা পায়। মহাযানের যাঁরা পথিক, বাহন তাঁদের বিনামূল্যে। তবু আমি অনেকখানি সান্ত্বনা পেলাম। অনুকূলের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত পরিবারের অন্য এক শ্রীমুখের আবির্ভাব কম সুখবর নয়। —

সুখের ওপারে সোয়াস্তি, কল্পনাকেও দেখা গেল। বিক্রমের দৃষ্টি যখন আমাদের দিকে থাকে না, সে তার দিকে দুষ্টুমিভরা চোখে তাকায়। মাতৃসুলভ চাহনি নয় ঠিক। বলতে আমি বাধ্য। বরং জামাতৃসুলভ বললেই ঠিক হয়।

তাকায় আর হাসে। বলে—'আহা। দুটি অনাথ বালক-বালিকা। কোন্ দেশ থেকে কী ঘটনাচক্রে পড়ে কত টাল খেয়ে এখন পাশাপাশি দুই বাড়িতে এসে জমেছে। যদি কোনো গতিকে এদের মধ্যে প্রাণের মিল হয়—তারপর

কোন এক গোধূলি লগ্নে দু হাত এক হয়ে যায়—আহা।'

ওদের পরস্পরের অকস্মাৎ মিলন করিয়ে দিলে হয় না? এ সব ব্যাপারে চার চোখের মারপ্যাঁচ শুনেছি নাকি অব্যর্থ। আমারো বেশ উৎসাহ দেখা যায়। এক মেলায় রথ দেখা আর কলা বেচা—মন্দ কি? কল্পনাকে মাতৃত্ব-ভার থেকে বাঁচানো আর অনুকূলকে জামাতাবান করা—এক ধাক্কায় মাতৃদায় ও কন্যাদায়ের গ্রন্থিমোচন, মন্বন্তরের ওপরে মহামারি। মন্দ কি?

'মেয়েটা যখন রাস্তার নলকূপ থেকে জল নিতে আসবে তুমি লক্ষ্য রেখো, বিক্রমকেও জল আনিতে পাঠাবো তখন।' কল্পনা বাতলালো।—'বুঝেছ?'

এরকম লক্ষ্য রাখতে ভালোই লাগে আমার—বিশেষ করে কল্পনার ছাড়পত্র পেলে তো কথাই নেই। রূপলক্ষ্যের এই সব উপলক্ষ্য ছাড়বার নয়।

সাধুসংকল্প বেশিক্ষণ অচরিতার্থ থাকে না। সেই দিনই—কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শুভলগ্ন এলো। বিক্রমকে হেঁকে বললাম, 'বৎস, যাও তো। পরিষ্কার করে এক পেয়ালা জল টিউব ওয়েল্ থেকে ধরে নিয়ে এস। গরহজম হয়ে বড্ড গলা জ্বলছে। নলকূপের জল উপকারী শুনেছি।'

'যাই বাবা।' বলে বিক্রম চলে গেল।

তারপর আর লক্ষ্য রাখতে পারা গেল না। কেমন বাধ-বাধ লাগল। দুটি তরুণ-তরুণী প্রথম মিলন—মিলন-লগ্নের বিলগ্নতা—বিধাতা ছাড়া আর কারো সেখানে নজর দেওয়া উচিত নয়। কবিগুরুর 'দুজনে যেথায় মিলেছে সেথায় তুমি থাকো প্রভু, তুমি থাকো। দুজনে ডাকিছে দোঁহারে তাদের তুমি ডাকো, প্রভু, তুমি ডাকো' স্মর্তব্য।

জানালা থেকে সরে এসে কল্পনানেত্রে দৃশ্যটা দেখতে লাগলাম (কল্পনা পাশের ঘরে বসে দেখছিল আশা করি)।

পরমুহূর্তেই দুদ্দাড় পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। বিক্রম সিং সিঁড়ি ভেঙে একছুটে ঘরে এসে প্রবেশ করেছে—কিন্তু বিক্রমের কোনো চিহ্ন নেই। আগের বিক্রম নয় যেন। মাথার চুল খাড়া, মুখ হাঁ-করা, চোখের চাউনি বিকট, হাতের গেলাস খালি।

হাসফাঁস করছে বেচারা। তার একটা আঙুল দেয়াল ভেদ করে নলকূপের দিকে নিবদ্ধ।

'ঐ। ঐ মেয়েটা।...ঐ মেয়েটা...।' দম নিতে নিতে সে বলে।

'কেন কি হয়েছে মেয়েটার?'

'কী বয়ানক!' বিক্রম বলে। ভীত জড়িত কণ্ঠে জানায়। 'উঃ, কী বয়ানক।'

বয়-আনক—সে তো বিয়ের পর, এখন কী তার। এখন boy আনার কথা ওঠে কেন? এ তো পূর্বরাগের কথা নয়। বিক্রমের উর্বশীলাভের লক্ষণ নয় এ. বরং বৈরাগ্যের লক্ষণ—ভাবনার কথাই বলতে হয়।

কিন্তু ভেবে কোনো লাভ নেই। বিয়ের পরে ছেলেপুলেরা আসবে, ভয়ঙ্কর রূপেই আসবে। (এই প্রসঙ্গে, বিয়ে হলেই পুত্র-কন্যা আসে কেন প্রবল

বন্যা'—আরেক মহাকবির মহোক্তি স্মরণীয়।) আর রমণীরা তারই তোড়জোড়, তার কোনো ভুল নেই এবং সেই প্রবল বানের তোড়ে ভাসবার কালে অপূর্ব রাগ, এমন কি ঘোরতর রাগও দেখা দিতে পারে, কিন্তু সেই দুরদর্শীতার অজুহাতে আগেই জীবন থেকে পূর্বরাগের রমণীয়তা বাদ দেয়াটা বেকুবি ছাড়া কী বলা যায়। কেননা, রমণীর র-মেটিরিয়াল বাদ দিলে, বয়ানকম বাদ দিয়ে যা থাকে, তাতে জহুরির হয়তো চলতে পারে, কিন্তু মানুষের চলে না। (এ মনি-হার আমার নাহি সাজে, কবি কি আর সাধে বলেছেন। কল্পনার দিকে তাকিয়ে গালে হাত দিয়ে আমিও তো কতদিন একথা ভেবেছিলাম।) এমনই হার, বলতে কী, রীতিমতন সাজার মতই প্রায়।

'অ্যাতো ভয় খাবার কী আছে?' আমি চটে যাই, 'তুমি একটি ছেলে ও একটি মেয়ে, খুব সম্ভব তোমার মতই ইভাক্যুয়ী। তোমার দেশের মেয়েই হয়তো। চেহারা দেখে তাই মনে হয়। এবং দেখতেও নেহাৎ মন্দ না, আমি ভালো করে দেখেছি। তোমার কি মাথা খারাপ নাকি?'

'হ্যাঁ।' বিক্রম ঘাড় নাড়ে।

বধ্য পশুর বন্য চাহনি ওর চোখে। আমি ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিই, 'ছেলেমানুষ। কখনো বোধহয় কোনো মেয়ের প্রেমে পড়ো নি ভয় খাচ্ছ তাই। কিংবা ওকে দেখে হয়তো তোমার দেশের কথা মনে পড়েছে—বোমার কথা, কোম্পানীর কাগজের কথা—তাই না? পূর্বস্মৃতির বৃশ্চিক দংশন-যাকে বলে—হ্যাঁ?'

'হ্যাঁ বাবা।' সায় দেয় বিক্রম।

'শোনো বলি, ভেবে দ্যাখো কথাটা।' রমণীয় সুরে আমি শুরু করি এবার, 'বিদেশ-বিভুঁয়ে তুমিও একা, ও বেচারীও একলাটি। তোমাদের দুজনের মধ্যে ভাব হলে কি ভালো হয় না? তুমি এ-বাড়িতে—ও ও-বাড়িতে—কয়েক গজের মাত্র তফাত। এমন কি আর ব্যবধান? পাশের বাড়ির মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়া এদেশের রেওয়াজ। এ বাড়িতে দুষ্টু প্রজাপতি থাকে, ও বাড়িতে ফুটন্ত গোলাপ। রোমে যখন থাকবে, তখন রোমকদের মতই থাকবে,—তাই নিয়ম। আমাদের শাস্ত্রেও বলে দিয়েছে—যস্মিন দেশে যদাচার। তার মানে এদেশে এসে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে—তাই কি নয়? আমরা তো মনে করেছি ওর সঙ্গে তোমার—মানে, ও যদি তোমার বউ হয় তো বেশ হয়—এ বিষয়ে তোমার—'

বিক্রম ভয়ার্ত চীৎকারে আমার দুই হাত জড়িয়ে ধরে : 'বলবেন না বাবা, বলবেন না। ও—ও-ই আমার বৌ।'

বিক্রমের কাছ থেকে এ রকম আঘাতের আশা আমি করি নি। সামলাতে আমার সময় লাগল!

'তুমি বিয়ে করেছ, একথা তো বলোনি বিক্রম?'

'এখনো করিনি, তবে ওর সঙ্গেই আমার বিয়ের কথা হয়ে আছে।' বিক্রম

বলল: 'বর্মা থেকে আমার পালিয়ে আসবারও একটা কারণ আপনাকে বলেছি তো।'

'কখন বললে আমায়?' আমি অবাক হয়ে যাই।

'বলি নি কি, ও আমার পিছু নিয়েছিলো—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যাপার। বলি নি আমি আপনাকে?'

'বলেছিলে বটে, গেস্ট হোস্ট অনেক কথাই বলেছিলে—মনে পড়ছে এখন। আমি অন্য মানে ধরেছিলাম, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলতে তোমার এই দশশালার বন্দোবস্ত বুঝতে পারি নি।' আমি বলি।

'দশ শালা বন্দোবস্ত আমি জানি। বাংলা দেশের জমিদারি ব্যবস্থা, তাই না বাবা?' বিক্রম হাত নাড়ে: 'তার মধ্যে জমিদার হচ্ছেন নম্বর এক, তারপর জমিদারের বেনামীতে জোতদার, তার পরে জমিদারের ছেলে, দৌহিত্র, ম্যানেজার, —বিক্রম আঙুল গুণে যায়—'নায়েব, গোমস্তা, পেয়াদা, পাইক—এই তো হল আট।......আর দু'শালাকে খুঁজে পাচ্ছিনে।'

'আদালতে খুঁজলে পাবে—উকিল আর মুহুরি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ' বিক্রম উল্লসিত হয়ে ওঠে, 'কিন্তু এসব তো জমিদারী ব্যাপার, এর সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ কি?'

বিয়েও যে একটা জমিদারী বৎস। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই যে। বিয়ে করলেও তো শালারা জোটে, সময়ে সময়ে দশজনাও জুটে যায় কখনো কখনো। তবে তোমার বরাত ভাল হলে চাই কি, দশ শালা না হয়ে দশ শালীও হতে পারে। না তেমন কপাল তুমি করো নি বুঝি?'

'ওর সঙ্গে আমার কিছুতেই মনের মিল হচ্ছে না,' বিক্রম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জানায়।—'নইলে বিয়ে করতে আর কি ছিল?'

'সে তো বিয়ের পরেই হয় না গো, ঐ তোমার মনের মিলন। কিন্তু তা কি তোমাদের বিয়ের আগেও হচ্ছে না?...তাহলে—'

'তাহলে আর কী হবে।' ওর দীর্ঘনিশ্বাসে আমিও ডিটো দিই অবশেষে।

কল্পনা কিছুদিনের জন্যে বোনের বাড়ি আসানসোলে বেড়াতে যাবে, তাকে তুলে দিতে গেছলাম স্টেশনে। দিতে গিয়ে আসানসোল অবধি তুলতে চলেছিলাম। পত্নীভক্তির পরাকাষ্ঠা করে, অতুল কীর্তি রাখতে প্রস্তুত হয়েছিলাম, কল্পনাই কিন্তু বাধা দিল আমার বাহবাড়ম্বরে। ধরে বেঁধে শ্রীরামপুরেই নামিয়ে দিল আমায়।

জানি গো জানি, পত্নীভক্তি কত তা কি আমার আর জানা নেই। শ্যালিকা-ভক্তির জন্যেই ছুটে চলেছ তুমি মশাই।' বলল ও।

এর পরে আর কোন্ মশাইয়ের প্রাণে না ঘা লাগে? প্রাণে এবং আত্ম-সম্মানে? আহত হয়ে আমি এই বি-শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেছি। আর সেই থেকে ফিরতি ট্রেনের প্রত্যাশায় বসে আছি হাঁ করে। অর্ধাঙ্গহারা পথে পড়ে থাকা হাফ্সোলের মতই প্রায়।

বসে আছি আর আমার মত বন্ধুভাগ্যকে ঈর্ষা করছি। কেবল বিবাহের দৌলতেই আমার বন্ধুদের কেউ প্রতিভাবান, কেউ বা যীশ-কার, কেউ আবার স্নেহ-ধন্য। কারো বা অলকা-বিলাস, কারো মত মমতা-ময় আর হয় না। কেউ পৌত্তলিক, নিতান্তই পুতুলের পূজারী—কারো বা বেলুর-মঠ। কারো বা 'তৎসবিতুর্বরেণ্যম্'—সেই সবিতার মতন বরেণ্য আর নেই। কিন্তু হায়, কল্পনাকুশল আমাকে বলা যায় না কিছুতেই।

ওর কাছে কোনো কৌশলই খাটে না আমার। কল্পনালোকের নই, নিতান্তই আমি কাল্পনিক।

বসে আছি সেই কখন থেকে। ঝাঁ ঝাঁ রোদ। বেলা আড়াইটে হবে তখন। খাঁ খাঁ প্ল্যাটফর্মে দুজন মোটে মানুষ। আমি এবং আরেকজন। দূর থেকে তাঁকেও খুব চটিতং মনে হল। যেন সব কিছুর উপরই বিরক্ত হয়ে বসে আছেন। গাড়ির সংখ্যা কমে গেছে যুদ্ধের দরুণ। তার ওপরে এ গাড়িটা আবার লেট্। আমি বসে বসে মশা মারবার চেষ্টা করতে লাগলাম। এক একটা মশা কামড়াচ্ছিল এমন যে।

সেই বিরক্ত লোকটিরও এ ছাড়া করবার কিছু ছিল না। টিকিটঘরের সামনেকার বেঞ্চিটায় বসেছিল সে। খানিকক্ষণ মশাদের সঙ্গে মারামারি করে ক্লান্ত হয়ে বিধ্বস্ত লোকটা দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। আমার সারা জীবনে আমি এমন তিতবিরক্ত মানুষ দেখিনি। মনে হয় যেন কোনো নিগূঢ় দুঃখে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে বেচারা—তা সে দুঃখ কোনো ভালবাসার প্রভাবে কিংবা একটা ভালো বাসার অভাবে—যাই হোক্ না।

হঠাৎ লোকটা মুখ তুলে তাকালো। প্ল্যাটফর্ম-প্রসারিত তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও তাকালাম। দেখবার মত কোথাও কিছু ছিল না কিন্তু। অন্তত ঐভাবে তাক করে তাকানোর মত আমার চোখে তো কিছু ঠেকল না।

কিন্তু ভয়ানক বিরক্ত লোকটিকে ভয়ঙ্কর উত্তেজিত দেখা গেল। কী যেন দেখে তড়াং করে সে লাফিয়ে উঠল—ছুট লাগালো প্ল্যাটফর্ম ধরে। আমি বেজায় অবাক হয়ে গেলাম। যেমনকার স্টেশন তেমনি আছে—দৃশ্য-পটে কোথাও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তিলমাত্র না। আপ্ কি ডাউন কোনো রেলগাড়ির যে টিকি দেখা গেছে তাও নয়। তুমি গাড়ি ধরবে কি তার তলায় পড়ে আত্ম-হত্যা করবে, সেই জন্যেই মরীয়া হয়ে ছুটেছ, তাও বলা চলে না।

আমি কিছু আন্দাজ করতে পারলাম না। লোকটার পশ্চাদ্ধাবন করলে হয়তো কিছু অনুধাবন হত, কিন্তু তারও কোনো তাগাদা বোধ করলাম না বিশেষ।

দেখলাম, লোকটা মাল ওজনের মেশিনের কাছে গিয়ে খাড়া হল! 'এর জন্যেই এত দৌড়াদৌড়ি? কী এমন দরকার ছিল এত? মেশিন কিছু পালিয়ে যাচ্ছিল না'—বললাম আমি আপন মনে।

মেশিনের ওপরে দাঁড়ালো সে তারপরে! নিজের ওজন বুঝতে চেষ্টা করল।

পরমুহূর্তেই সে লাফিয়ে নেমে পড়ল মেশিনের থেকে।

হাবভাবে মন হল এক্ষুনি সে বুঝি মেশিনটাকে পদাঘাতে জর্জর করবে। এই মারে কি সেই মারে। কিন্তু কি কৌশলে সে আত্মসংবরণ করল জানি না, আস্তে আস্তে আবার সে টিকিটঘরের সামনের বেঞ্চটায় এসে পর্যবসিত হল। তার কাণ্ড দেখে আমি কৌতূহলাক্রান্ত হয়েছিলাম বলতে বাধা নেই।

পায়চারি করতে করতে গেলাম তার কাছে।

'আজ দিনটা কি চমৎকার!' আরম্ভ করলাম এই বলে। প্রথম ভাব করতে দিনক্ষণ দেখতে হয়—সেইটেই সভ্য কায়দা। দোস্তির দস্তুর।

'যা বলেছ বলেছ, আর বোল না।' জবাব এল লোকটার কাছ থেকে। 'তোমার কথা শুনলে যা মনে হয় তোমার যদি ততটাই মাথা খারাপ হয়ে থাকে, তোমাকে ওরা রাঁচীতে নিয়ে গিয়ে তালা-চাবি দিয়ে রাখবে। মোটেই আজ চমৎকার দিন না। খুব বিচ্ছিরি দিন। দুনিয়াটাও যার পর নাই বিচ্ছিরি।'

'দিন-দুনিয়ার মালিক খোদা'—নতুন করে শুরু করতে যাই।

'চেপে যাও, চেপে যাও', সে বলে উঠলো, 'আর বেশি হাস্যকর হবার চেষ্টা কোর না, তুমি কিছু শিব্রাম চক্কোত্তি নও।'

মন্দ নয়। সূত্রপাতের আগেই সূচিবেধ।—'কিসে যেন আপনি বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন মনে হচ্ছে?' আমি সহানুভূতি ভরে জিজ্ঞেস করি ভদ্রলোককে।

লোকটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো। তারপর উঠে দাঁড়াল চট্ করে। সটান খাড়া হল আমার সামনে।

'তাকান—তাকান তো আমার দিকে।' বলল চেঁচিয়ে। 'কী রকম দেখছেন আমায়?'

আমি তাকালাম। 'বেশ তো।' তাকিয়ে আমি বললাম।—'ভালোই তো দেখা যাচ্ছে! চমৎকার বোধ হচ্ছে আমার।'

'ভালো করে তাকান।' পুনশ্চ ঘোৎকার হল তার। 'আরো ভালো করে দেখুন।'

আবার আমি তাকালাম। দিব্যি মনে হল তাকে আমার। অন্তত দেহের দিক দিয়ে তো বটেই! বহির্ভাগে কিছুই ত্রুটি নেই, তবে যদি মাথার ভাগে কোনো গোলযোগ ঘটে থাকে বলতে পারি না।

'দৃশ্যের দিক থেকে কিছু খারাপ বলে ঠাওর হচ্ছে না তো।' তাকে জানালাম : 'সিনারি মন্দ নয় তেমন।'

কিন্তু লোকটি আমার জবাবে এবার আরো বেশি ঘোৎকার ছাড়লো।

'যে লোকটি এই রেশনিং বার করেছে তাকে যদি একবার সামনে পেতাম... আমি সেই বদমাইসটাকে একবার বাগে পেলে টুক্রো টুক্রো করে ছিঁড়ে খেতাম।'

'বটে—অ্যাতো রাগ?' আমি বলি, 'কেন, কী করেছে লোকটা?'

'আমার সর্বনাশ করেছে। আমি আর সে আমি নেই। সমস্ত কেবল ঐ

রেশনিং-এর জন্যেই।'

'বটে বটে? খুব খারাপ কথা তো!'

'খারাপ বলে খারাপ! অতিশয় খারাপ। দৈনিক বরাদ্দ দেড় পো চাল—তার বেশি এক ছটাক পাবার যো নেই—কোনো কালোবাজারে কি কোথ্থাও আপনি পাবেন না। এখন একবার তাকিয়ে দেখুন আমার দিকে—আমিই তার পরিণাম।'

আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চুপি চুপি এবার সে একটা গোপন কথা কয়: 'রেশনিং চালু হয়ে অবধি আমি আধপেটা নয়, সিকিপেটা না, দুয়ানিপেটা খেয়ে আছি। আগে আমি এবেলা দেড় সের ওবেলা দেড়সের চালের ভাত মারতাম মশাই। বিশ্বাস করবেন আপনি?'

আমি বিশ্বাস করি—দ্বিরুক্তি না করেই।

'আমার ওজন কত বলুন তো এখন?' ভোজন থেকে একেবারে ওজনের কথায় চলে আসেন ভদ্রলোক।

'মণ দুয়েক হতে পারে' আমি আন্দাজ করি।

'কিছু কম। সে বলল: 'ওর চেয়ে কিছু—এই সের আড়াইটাক কম।'

এই বলে সে পকেট থেকে লম্বা এক কাগজের ফর্দ বার করে আমার চোখের ওপব মেলে ধরে। তাতে মেলাই অঙ্ক। সে বলতে থাকে: 'গত সপ্তাহে ছিলাম পাক্কা দু' মণ, তার আগের হপ্তায় দু' মণ আড়াই সের। এমন করে হপ্তা পিছু আড়াই সের করে কমে কমে কত দিনে আর হতে পারব। এত আস্তে আস্তে হলে আর কী করে হয়।' ওর ভগ্নকণ্ঠে আবার আপসোস—দারুণ অসোয়াস্তি।

'খুব আস্তে আস্তে হচ্ছে বুঝি?' আমি বলি।

'অনেক—অনেক সপ্তাহ লাগবে?' সে বলে।

'অনেক সপ্তাহ? কী বলছেন?'

আবার সে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে আরেকটা গুপ্ত কথা ব্যক্ত করল। যদিও সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি বা কানাকানি করার কোনো দবকার ছিল না: 'অথচ দেখন, আমার বিজ্ঞাপন তৈরী। লিখেই রেখেছি, খবর কাগজে ছাপতে দিলেই হয়। দাঁড়ান দেখাচ্ছি আপনাকে।'

আরেক পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে আমার হাতের ওপর ফেলে দিল সে।

আমি বিস্ফারিত নেত্রে পড়লাম:

'ঠিকানা লিখে রাখুন। এক এবং অদ্বিতীয়

হলধরচন্দ্র বর্ধন

বিখ্যাত জীয়ন্ত কঙ্কাল।

বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষীণকায় পুরুষ—এই চলমান কঙ্কালকে—আপনার প্রদর্শনীর জন্য অবিলম্বে সংগ্রহ করুন। দক্ষিণা বেশী নয়। পোস্ট বক্স

নং......'

'কিন্তু দেখুন তো কী মুশকিল। কোথাও এটা আমি ছাপতে পারছি না। ছাপানো যায় না এখনো। এখনো যে কত হপ্তা লাগবে কে জানে? এত আস্তে আস্তে আমার দৈহিক অবনতি ঘটছে—মাত্র আড়াই সের কম দুমণ—এখনো বিস্তর দিন পড়ে আছে—বহুৎ-সপ্তাহ পড়ে রয়েছে. এখনো আমার অনেক বেকার দিন।'

লোকটার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে আসে। আমি সান্ত্বনা দানের ভাষা পাই না।

'কেন বেকার কেন? এর আগে আপনি কি করতেন?' আমি প্রশ্ন করিঃ 'আর রেশনিং-এর সঙ্গেই বা আপনার বেকার দশার কী সম্পর্ক আমার তো মশাই এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে আদৌ ঢুকছে না।'

'কেন, এ তো খুব সোজা কথা। মাথায় ঢুকছে না আপনার? রেশনিং হয়ে আমার খাওয়া গেল কমে, আমি রোগা হতে শুরু করলাম আর সঙ্গে সঙ্গে আমার চাকরিটাও খোয়া গেল। তেমন সুখের চাকরি কী পাবো আমি আর? আর তা পাওয়া যাবে না মশাই।'

'আর পাওয়া যাবে না?—এমন কী job?' আমার তাজ্জব লাগে। তাহলেও চাকরি খোযা যাওয়ার খোয়ার আমি জানি।

শুনে আমার দুঃখ হয়।—'কিসের চাকরি ছিল আপনার?'

'আরাম করে সোফায় বসে থাকো। আর লোকে পয়সা দিয়ে খুশি হয়ে তোমায় দেখে যাবে। আপনি আমার নাম শুনেছিলেন কি না জানি না, আমিই সেই প্রসিদ্ধ হলধরচন্দর্ বর্ধন, এ যুগের ঘটোৎকচ। পৃথিবীর সবার চেয়ে হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি বলে গণ্য ছিলাম আমি। যেমন হৃষ্ট তেমনি পুষ্ট—সাড়ে তিন মণের কাছাকাছি। কিন্তু না ঘরকা না ঘাটকা—এখন কি এই নগণ্য আমাকে দেখলে কেউ চিনতে পারবে?'

রেলগাড়িতে বাদুড়ঝোলা হয়ে প্রাণ এবং হ্যাণ্ডেল হাতে করে হাওড়ায় পেঁৗছে সিনেমা-দর্শন সেরে বাড়ি ফিরলাম। সারা সময়টা হলধর বর্ধন মনের মধ্যে খোঁচাচ্ছিল। স্থূলত্বের সিংহাসনচ্যুত হয়ে এখন সে হুলের মত সূক্ষ্ম হতে চায—কোনদিক দিয়ে হুলুস্থুল না হতে পারলে তার সুখ নেই। হলধর চন্দর্ এ অবধি নিজেকে অর্ধচন্দ্রও দিতে পারেনি—এখনো সে বেকার। অতি-মানবদের সগোত্র এই হলধরের অতিশয়োক্তি না হয়ে সোয়াস্তি নেই। সে র‍্যাশনাল মানুষ নয়, রেশনিং-এর বিরুদ্ধে সে।

আমারো স্বস্তি ছিল না মনে। তারপর বাড়িতে পা দিতে না দিতেই সাইরেন বেজে উঠল। একটু যে আরাম করে বিছানায় গড়ানো তারও যো রইল না।

কম্বল দুখানা আর বালিশটা বগলে নিয়ে গলে পড়া গেল। ক' ঘন্টার ধাক্কা কে জানে। দরকার হলে লম্বা হওয়া যাবে সেখানেই।

আমাদের পাড়ার এক ধনিক ভদ্রলোক তাঁর বাড়িতে অনেক খরচ করে আণ্ডারগ্রাউণ্ড শেলটার বানিয়েছিলেন—মাটির নীচে বিরাট এক হল—পেল্লাই জায়গা। দিব্যস্থান—শোয়ার বসার বেরোবার কোনো অসুবিধা নেই—চেয়ার কুশন চৌকি সোফার ছড়াছড়ি। সাইরেন বাজলে আমাদের সবার সেখানে অবাধ আমন্ত্রণ ছিল এবং বলতে কি, সেখানে বসে নিশ্চিন্ত মনে বিমান-আক্রমণকে উপভোগ করতে ভালোই লাগত বরং।

ফুটফুটে জ্যোৎস্না দিয়েছে—কিন্তু চাঁদমুখে যেন কালি ঢেলে দেওয়া। চাঁদনি রাত যে এমন হতে পারে কে জানত? চাঁদের আলো চিরদিনই আঁতে ঘা মারে, তা জানি,—কিন্তু সৃষ্টির শুরু থেকে এমন আঁতকানো গা ছম্‌ছম্‌ করা জ্যোৎস্না কি ওৎ পেতে এতকাল ধরে আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল?

শেলটারের মুখে গিয়ে আরেক কাণ্ড দেখা গেল, এক ছাগলছানা এবং আরেক ছোট্ট ছেলের দারুণ হাতাহাতি। ছেলেটা তার প্রিয় পাঁঠাটিকে নিয়ে ভূগর্তে সেঁধুতে চায়, ছাগল কিন্তু মোটেই রাজী নয়। ছেলেটা অস্থির হয়ে পড়েছে, কিন্তু পাঁঠার মনে কোনো বিকার নেই—এতবড় বোমার ধাক্কার নিজেকে বাঁচাতেও সে নারাজ।

ছেলেটার ফেলোফিলিং আমাকে মুগ্ধ করল, যদিও বড় হয়ে উঠলে সে বদলে যাবে, এই বন্ধুপ্রীতি তার থাকবে না, জানা কথা। তখন অন্যরূপ নিয়ে এই পাঁঠাকে উদরের পথে নিজের সহচর করতেই সে চাইবে, তবু আমি আজ তার সাহায্যে অগ্রসর না হয়ে পারলাম না।

সে আর আমি দুজনে মিলে চ্যাংদোলা দোল পাঁঠাটাকে নিয়ে চললাম। হেঁটমুণ্ড জীবটি হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলল—তারস্বরে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়ে। বলিরাজ স্বর্গ ফেলে পাঁচজন পণ্ডিতের সঙ্গে গোল্লায় যেতে প্রস্তুত ছিলেন—আর এতগুলি সুধীসজ্জন ইতর ভদ্র আমাদের সঙ্গে রসাতলে প্রবেশ করতে এর কোথায় যে এত বাধ-বাধ—আমি তো তা বুঝি না। পাঁঠা আর কাকে বলে! —বলির ভয়ে ভড়কাচ্ছে কিনা কে বলবে।

যাক্‌, কোনোরকমে তো পাঁঠাশুদ্ধ শেলটারে পৌঁছনো গেল। ..

বাঁশি বাজতে না বাজতে পাড়ার প্রায় সকলেই সেখানে জমায়েৎ দেখলাম। কর্তা গিন্নী ছেলে পুলেরা কেউ পেছনে পড়ে নেই, আমিও এক কোণে গিয়ে একটা চৌকি দখল করে আমার কম্বল বিছালাম।

কোথাও তাসের আড্ডা বসে গেছে—কোথাও বা গল্পের আসর। কেউ বা কোনো এক কোণে গিয়ে নভেল পড়তে মশগুল।

কোনো দলে ভিড়তেই আমার উৎসাহ ছিল না। সারা দিন ধকল গেছে ভারী। তার ওপর আবার সিনেমা শো। চোখ ক্লান্ত, মন কাহিল—চোখের পাতায় যত রাজ্যের ঘুমের ভিড়। এত ভিড় ঠেলে শুতে পারলে—এই ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে বাঁচি। চৌকিতে বসে বসেই ঢুলতে শুরু করে দিয়েছি।

ও'য়া-ও'য়া-ও'য়াও! নতুন সৃষ্টির কান্নাই বুঝি—আকাশে ভাসছিলো তখনো। দু'একটি সদ্য ভূমিষ্ঠ বোমার আর্তনাদও ভেসে আসছিল সেই সঙ্গে। কিংবা আমাদের অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফটের আওয়াজই হবে হয়তো বা।

হঠাৎ চেনা গলার স্বরে চটকা ভাঙলো। স্বরবর্ণ থেকে অক্ষর পরিচয়ে দেরী হবার নয়। আমাদের বিক্রমসিং যে! আমারই চৌকির অদূরে, আলো-অন্ধকারের আবছায়ায় আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে খিলান্ ঠেস দিয়ে বৎস সিংহই শ্রীবৎস রূপে বিরাজ করছেন। বিক্রম একা নয়, বিক্রম এবং আরেকজন। বিক্রমের উর্বশীই বোধ হয়, পাশের বাড়ির সেই মেয়েটিই মনে হল।

সজাগ হয়ে উঠতে হল। সবাইকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেও চৌকিতে বসে চৌকিদারি না করা ভাল দেখায় না। জমিদারের ব্যাপার স্যাপার লক্ষ্য করি। বলছিল বিক্রম : ফাঁকা জায়গার চেয়ে এই ভিড়ই আমার ভালো লাগে। বেশ নির্জন। নির্জন। নির্জন আর নির্ঝঞ্ঝাট। কোনো ভয়ের কারণ নেই। এখানে কেউ আমাদের দেখছে না, কান খাড়া করেও নেই কেউ কোথাও। 'মিলতে হয় তো এমনি জায়গায়।'

পাঁঠাটা বলল : 'ব্যা ব্যা।'

সাদা বাংলায় তার সাধুবাদের মানে হচ্ছে, 'বাহবা বাহবা।'

'এই ভিড়ের ভেতর থেকে সরে পড়াও শক্ত আবার।' বলল উর্বশী। সেদিক থেকেও নিরাপদ—সেটাও বলো।'

'বিশ্বাস করো আমি সেদিন পালাইনি। প্রভু তথাগতের দিব্যি।'

বিক্রম বলতে যায়।

পাঁঠাটা পাশ থেকে উচ্য বাচ্য করে—'অররর্র্!' অর্থাৎ আরো কী বলবার আছে বলো। এহ বাহ্য, আগে কহো আর—এই জাতীয় কথাটা বলতে চায় বুঝি!

পালাওনি তো সেই বড় বাগানটা কি তোমাকে গপ্ করে গিলে ফেলে-ছিলো নাকি?...আমি একটা ফুল পাড়তে গেছি, আর অমনি দেখি তুমি পাশে নেই—' আমি একটা ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়েছিলাম। এমনি, মজা দেখতে। তুমি কি করো দেখবার জন্যেই। এমন সময়ে দেখলাম সুন্দর এক প্রজাপতি একটা ফুলের ওপর বসছে, হামাগুড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে ধরতে যাচ্ছি তাকে, আর সে ব্যাটা কেবলই আমার হাত ফসকে এ-ফুল থেকে সে-ফুলে গিয়ে বসছে—ভারী দুষ্টু প্রজাপতিটা! ধরব ধরব করছি সে প্রজা-পতিটাকে, মাঝখান থেকে একটা পুলিস এসে আমাকে পাকড়ালো—তারপর একদল পুলিস—আমাকে লুফতে লুফতে নিয়ে গেল। উঃ, কী কষ্টটাই না গেছে বাবা আমার!'

'আমাকেও ধরেছিলো পুলিসে। কয়েক দিন আটকে রেখে ছেড়ে দিল তারপর। অনুকূলবাবুর বৌ অবলাশ্রমের সেক্রেটারী—তিনিই আমাকে ছাড়িয়ে আনলেন।'

অন্ধকারের খানিকটা যেন ফিকে হয়ে আসে! ইডেন উদ্যানের সেই লোকটা—সেই হামান্‌ দিস্তা—সত্যি কি ঢোকিম্বর রাস্তা ধরেছিলো? নাকি, আসলে, প্রজাপতয়ে নমঃই ছিলো তার আদত মতলব?

বনমালীর বুনো মাথা মনে পড়েঃ আসামী বিক্রম সিং এবং অনুকূলপত্নীর আনুকূল্যলাভী উর্বশীর বিরহ-মিলন-কথার অনেকখানিই পরিষ্কার রূপ নেয়। পরের ব্যাপার তো জলের মত স্পষ্ট। অবলাশ্রমের সেক্রেটারী আমার শ্রীমতী প্রতিবেশিনীর অবলার শ্রমের পক্ষপাতী হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। অবলাটিকে সমর্থ দেখে টেনে এনে নিজের বাড়ির অনারারি পরিশ্রমে লাগিয়েছেন।

কিন্তু তারপরে আমার যত গোলমাল লাগে। সেদিনের বিক্রমের সন্ত্রস্ত চোখের সঙ্গে আজকের চোখা চোখা কথার খাপ খাওয়াতে পারি না। এর রহস্যভেদ করা আমার অসাধ্য মনে হয়।

'তোমাকে তো বেশ চটক্‌দার শাড়ী-ব্লাউজ দিয়েছে দেখছি,' বিক্রম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে : 'গিন্নী লোক তো বেশ ভালো।'

'গিন্নী দেয় নি। কর্তা দিয়েছে।' উর্বশীর জবাব।

'কর্তা তো ভাল নয় তাহলে।' রুক্ষ কণ্ঠ শুনলাম বিক্রমের।

খিলান্‌ ভেদ-করা শানিত দৃষ্টিও দেখতে পেলাম যেন।

'কর্তাটাই ভালো।' বললে উর্বশীঃ 'তোমাকেও তো চমৎকার জামাকাপড় দিয়েছে। গিন্নীই বোধহয়?'

'না, কর্তা দিয়েছেন।' বিক্রম ঢোঁক গিলল।—'কর্তা তত খারাপ নয় আমাদের। তোমাদের কর্তার মত না।'

আমিও ঢোঁক গিললাম, কেননা আমি ওকে কাপড়জামা দিইনি।

'তোমাদের কর্তার তুমি তো সব জানো।' মনে হল, ঠোঁট উল্টিয়েই কথাগুলো বললো যেন উর্বশী।

'ইচ্ছে করলে আরেক প্রস্থ শাড়ি-ব্লাউজ তার কাছ থেকেও আমি বার করতে পারতাম।'—কর্তার উপর কর্তৃত্বের এই কথাটা দয়া করেই যেন সে উহ্য রেখে দিল মনে হয়।

'হ্যাঁ, আমি জানবো না তো তুমি জানবে। তাই বটে আর কি।' উস্‌কে উঠলো বিক্রম : 'আমাদের কর্তার নামে তোমার কোনো কথা আমি শুনব না।'

'ঠিক কথা।'—আমি মনে মনে ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম।

একটু চুপ করে থাকার পর আবার ওর বিক্রম দেখা গেল।—'আমি বলছি ও বাড়িতে তোমার আর থাকা হবে না।'

'বা, তা কেন? উর্বশী একটু বিস্মিতই।

'কেন তা আমি বলব না। আমি বলছি এই যথেষ্ট।'

'বারে, তুমি বললেই হল।' উর্বশীও তেরিয়া।

'এই জন্যেই তো তোমার সঙ্গে আমার মনের মিল হয় না।' বিক্রম জানিয়ে দেয়।

'তোমার আবার মন বলে কিছু আছে নাকি?' উতোর গায় উর্বশী।

তারপর চুপচাপ। আবছা অন্ধকারে বিক্রমের দীর্ঘনিশ্বাস ভেসে আসে। একটার পর একটা।

'যখনি আমি একটা মিষ্টি কথা বলতে যাই অমনি তুমি একটা ঝগড়া বাধাও। কথাটা পাড়বার সুযোগ দাও না আমায়।' বিক্রম ফোঁস্ ফোঁস্ করে—অনেকক্ষণ পরে।

'কি করে জানব যে, তুমি মিষ্টি কথা কইতে আসছ? তোমার মনের তত্ত্ব পাবো, আমি কি হাত গুণি?'

'নারীসুলভ সহজ বোধশক্তি নেই তোমার?—কত নভেলেই তো লিখেছে—কোন্ বাংল্যা নভেলটা পড়তে বাকী রেখেছি—বিশেষ, আমাদের ব্রহ্মদেশের সেই শরৎ চাটুজ্যে—যিনি বাংলা মুলুকে এসে বাঙালী বনে অবশেষে আমাদের ভুলে গেলেন—তাঁর কোন্ বইটা তোমার পড়া আছে শুনি?—সেই সব পড়লেই তো মেয়েদের সহজ বোধশক্তি জন্মায়।'

'মেয়েলী বোধশক্তিতে আমার বিশ্বাস নেই আর। বার বার তার ভুল হতে দেখেছি—কেন, এই তোমার বেলাতেই তো। প্রমাণ হয়েছে যে—'

'না। প্রমাণ হয় নি।' বিক্রম বাধা দেয়। প্রবল বিক্রমে।—'কিছু প্রমাণ হয় নি।'

'প্রমাণ হয়েছে যে, নভেলের কথা সব মিথ্যে।'

'না—মিথ্যে নয়।' বিক্রম আগ্রহে উদ্‌গ্রীব। পরাক্রমে পরির দিকে প্রাগ্রসর। এখন, একজন উন্মুখ হলেই অপরের উদ্‌গ্রীবতা সার্থক হতে পারে। এখানে তেমন কোনো যোগাযোগ ঘটলো কিনা, আবছায়ার আড়ালে ভালো দেখা গেল না। হয়তো বা চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। তবে একটু উন্মুখের শব্দ এল যেন কানে। এই আড়ি পাতায় আমি নাচার। আড়ি দেওয়া আমার স্বভাব নয়। আড়ি করার মতই স্বভাববিরুদ্ধ। তবে কিনা, চোখের পাতায় যত সহজে বোঝা যায়, কানের বেলা তা অসম্ভব। কানের হচ্ছে স্বাধীন চাল। কানরা আমাদের অবাধ্য—একদম অবাধ্য। (এই জন্যেই কি অবোধ ছেলের কান মলে তার শোধ তোলা হয়?)

অনেকক্ষণবাদে অল্‌ক্লীয়ার আওয়াজ এল। আমিও কম্বল গুটিয়ে উঠলাম—ওদের পাশ দিয়ে—ওদেরকে না ঘাঁটিয়ে গুটি গুটি সকলের পিছু পিছু উঠে এলাম উপরে। আমিই এলাম সব্বার শেষে। সর্বশেষে আড়চোখে দেখে নিলাম হাত ধরাধরি করা ওরা দুজনে তন্ময় হয়ে রয়েছে।

'সবাই বেরিয়েছে তো?' আমার বহির্গতির পরে জিজ্ঞেস করলেন গৃহকর্তা।

বিক্রমের কথা মনে করে আমি মাথা নাড়লাম—সম্মতিসূচক মৌনতায়।

ফোটো আর ভালোবাসা অন্ধকারেই ভালো ফোটে—প্রেমের ঘোরালো পথ ঠিক সেখানেই গিয়ে শেষ হয় যেখান থেকে পুনরায় শুরু—সনাতন পুর্ণনবার সেই শূন্য পুরাণ—পুনর্বার—ফের পুনর্বার।

ভদ্রলোক বিজলীবাতি নিবিয়ে দিলেন নীচের।

নারী রহস্যময়ী

গোড়াতেই কিছু বলে রাখতে চাই।

কলম ধরার আগেই, কেন এই দুঃসাহসিক কর্মে লিপ্ত হয়েছি তার জন্যে একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার বোধহয়।

রহস্য কাহিনী কখনো আমি লিখিনি, লিখতে পারিনে—আমার তাবৎ লেখাই হাস্যকর (হয়ত এটিও শেষ পর্যন্ত তাই হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিছুই বলা যায় না—) তা সত্ত্বেও কেন যে এই রোমাঞ্চকর পথে অকস্মাৎ আমার পদার্পণ• তার একটা কারণ আছে অবশ্যই।

একজন বহু বিখ্যাত লেখক এই সংখ্যাতেই হাসির উপন্যাস লিখছেন জেনেই তাঁর আদর্শের অনুসরণেই যে আমার নিজের কীর্তির চেয়েও মহৎ হয়ে মহত্তর রচনার অপপ্রয়াস তা হয়ত ঠিক নয়। রজনীগন্ধার উদার দাক্ষিণ্যের অর্থলোভই যে আমায় প্রলুব্ধ করে এই বিপথে টেনে এনেছে তাও আমি বলতে পারি না।

অর্থের খাতিরে নয়, খ্যাতির অর্থেও না...

রজনীগন্ধার থেকে এ ধরণের রহস্যময় প্রস্তাব আসতেই আমি বলেছিলাম--ধীরে রজনী, ধীরে!

না, রজনীগন্ধাকে না, নিজেকে সম্বোধন করেই আমার ঐ উচ্চারণ—নিজের প্রতিই উক্ত বঙ্কিম-কটাক্ষ! এই হঠকারিতার পূর্বে তিনবার চিন্তা করে দ্যাখো হে! এ কর্ম তোমার সাজে কিনা, তোমার পক্ষে নিতান্তই সাজা হবে কিনা খতিয়ে দ্যাখো একবার!

বারম্বার নিজেকে একথা বলেছি, কিন্তু টাকাটা আগাম আসতেই হাতালাম। তারপরে বাধ্য হয়েই কলম ধরতে হল আর তারপরেই এই...এই রহস্যের অবতারণা!

এবং এই কথাগুলি বলা। আমার কাহিনীর ভূমিকা হিসেবে নয়—বস্তুতঃ, এটা আমার এজাহার।

বইটার সঙ্গে যে একটা হত্যাকাণ্ড জড়ানো তা আপনারা ধরে নিতে পারেন। রহস্য কাহিনীর সঙ্গে খুনোখুনি জড়ানো থাকে, থাকবেই।

আর প্রত্যেক হত্যাকাণ্ডেই, আসামীকে, এমন কি আসামী না হয়েও অনেককে এজাহার দিতে হয়। হত্যা ব্যাপারের এই একটা বড় দোষ। তাহলেও

এটাই দস্তুর। এবং এই দায় থাকার জন্যই অনেকের মনে হত্যাকাণ্ডের সাধ থাকলেও হাত উঠতে চায় না হঠাৎ।

কে হত্যাকারী? এই কাহিনীর হত্যাকারী যে কে তা খুঁজে বার করতে আপনাদের দস্তুর মত বেগ পেতে হবে। যাকে এবং যাকে যাকে হত্যাকারী বলে সন্দেহ করবেন শেষটায় দেখা যাবে যে সে নয়। যে লোকটি খুন হয়েছে আর যিনি গোয়েন্দা এই দুজন বাদে প্রায় সবার প্রতিই অপবাদে সন্দেহ হবে—এবং লেখক হিসেবে, বলতে কি, সেইখানেই আমার বাহাদুরি।

এমন কি, এক এক সময় গোয়েন্দার প্রতি সন্দেহ জাগাও কিছু বিচিত্র নয়—বাহাদুরির ওপরে সেটা আরো এক কাঠি! হয়তবা, শেষে যদি এমনও মনে হয়, যে খুন হওয়া লোকটি নিজেই খুন করে বসেছিল (অথচ সেটা তার আত্মহত্যা নয়) তাহলেও আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হব না।

ডিটেকটিভ কাহিনীতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই—যদিও বিস্ময়ের বিষয় পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে ছড়ানো থাকে। এবং সেই ছত্রাকারের শেষটায় গিয়ে কী দাঁড়ায়, একজন হত্যাকারীর দর্শন পাওয়াও দুর্ঘটনা হতে পারে—সেই চরম দুর্ঘটনার সাক্ষী হবেন আপনারাই।

তবে সেটা সম্পূর্ণই আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গীর উপরে নির্ভর করে—আমার পক্ষে আগে ভাগেই তা বলে দেওয়া সাজে না।

তবে একটা কথা আমি বলতে পারি, এবং বলতে চাই যে যাকে আপনারা কিছুতেই সন্দেহ করবেন না, করতেই পারবেন না—আসলে সে-ই হচ্ছে এই বইয়ের আসল হত্যাকারী।

সে আর কেউ আমি।

এই কাহিনীর হত্যাকারী আমিই। এই কথাই আমি হলফ করে বলতে চাই। সেই হেতুই আমার এই এজাহার।

ডিটেকটিভ গল্প আমি লিখি না। লিখতেন আমাদের হেমেনদা—স্বর্গত হেমেন্দ্রকুমার রায় আর লেখেন আমার বন্ধু ডাঃ নীহার গুপ্ত। আগেকার কালে লিখে গেছেন পাঁচকড়ি দে, দীনেন্দ্রকুমার রায়, চমৎকার লেখা তাঁদের, পড়ে চমৎকৃত হয়েছি। কিন্তু মনে মনে প্রেরণা পেলেও কখনো তাঁদের অননুকরণীয় রচনার অনুসরণে যাবার উৎসাহবোধ করিনি কখনো। তবে এতদিন পরে সেই সখ হোলো কেন, তার গোড়াকার কাহিনীটি বলি এবার।

আমার এই এজাহারের মধ্যে সেই কথাটাই লিপিবদ্ধ।

এর গোড়ায় এই রজনীগন্ধা নয়, হেমেনদাই বরং, গোড়াতেই তা বলে রাখি।

আমাদের হেমেনদাকে নিয়েই কাণ্ডটা ঘটেছিল। এর প্রেরণা পেয়েছিলাম আমি সেই কালেই। হেমেনদার জীবদ্দশাতেই বদ্ধমূল সেই বাসনা অগোচরে অবচেতনে লালিত হয়েছে এতকাল। সে বিষয়ে আমি সচেতন না থাকলেও আমার অন্তর্গত সেই মনসা অধুনা এই তরুণ সম্পাদকের ধুনার গন্ধে উস্কানি পেয়েছেন—ফলে যা হবার! অবচেতনের গহ্বর থেকে ফণা বিস্তার করে

বেরিয়েছেন। সেই প্ররোচনা থেকেই এই রচনা।

এবার আমার এজাহারের বক্তব্যে আসা যাক।...

খ্যাতির জন্য মানুষ কী না করে! খ্যাতির খাতির একটা আলাদা। এমন কি, লেখকরাও চায় তাদের খ্যাতির চৌহদ্দি বাড়ুক। যিনি কবিতা লেখেন তিনি হঠাৎ উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। আর উপন্যাসকার তাঁর চারপোয়া কীর্তি উপচে উঠে কবিতার কসরতে লেগে যান—নিদেনপক্ষে গদ্য কবিতায়। এবং তারপরেও—না টাকু গিয়ে নাটকে চলে যান সড়াৎ করে—এমন কি, প্রহসন হয়ে উঠতেও তাঁর বাধে না। আরম্ভর আগেও যেমন আরম্ভ থাকে তেমনি শেষ হবার পড়েও আড়ম্বরের শেষ হয় না। এমনই হয়ে থাকে। অতএব আমিও কিছু তার ব্যতিক্রম হতে পারি না।

আমার এই আরম্ভর আগেও যে আরম্ভ ছিল, সেই কথাই বলি।

আমার যে খ্যাতি আছে, বা কদাচ হতে পারে, এ সন্দেহ আমার কখনো ছিল না। কিন্তু সেই ধারণা সেদিন আমার টলেছিল। একজনের পত্রাঘাতেই সে ধারণা টলিয়ে দিয়েছিল আমার।

সেকালে ডাকঘর ছিল না, ভাবুন একবার। লেখকদের কী কষ্টটাই না গেছে। নিজেদের খ্যাতির বহর টের পাবার কোনো উপায় ছিল না তখন। দূরে দূরান্তরের পাঠক পাঠিকার কাছ থেকে চিঠিপত্রের ছলনায় নির্জলা সাধুবাদ না এলে কি লেখবার সাধ হয়? লেখার আস্বাদই চলে যায়। আপনারাই বলুন না! অথচ ভবভূতির কথাই ধরুন, কিম্বা কালিদাসকেই ধরা যাক। তাঁদের দুঃখের কথা ভাবলে আমাদের দুঃখ হবে। চিঠি পেতেন না, তবু কোন সুখে যে তাঁরা লিখতেন, লিখে লিখে মরতেন তাঁরাই জানেন!

বাস্তবিক, সেকালে তাঁদের কোন বই পাঠকসমাজ ঠিক কিভাবে নিল জানবার কোনো উপায়ই ছিল না তখন। কেননা, সেকালে ডাকঘর ছিল না, তাই পাঠকদের জানাবার কোন উপায় ছিল না। সত্যি বলতে, কোন লেখক তাঁর পাঠকদের কাছ থেকে কতগুলি করে চিঠি পেয়ে থাকেন তাই তো তাঁদের সাফল্যের নিরিখ!

কেবল সম্মানদণ্ডই নয়, তাঁদের লেখার মানদণ্ডও তাই। তাই নাকি?

অবিশ্যি, ভবভূতির বাল্যকালের প্রাক্তন সতীর্থদের কয়েকজন ছিলই যারা পলান্ন কি পরমান্ন খেতে পেলে তাঁর লেখার বাহবা দিতে কার্পণ্য করত না। পারস পিস্টকের বিনিময়ে চিরদিনই তারা তাঁকে উৎসাহ দিয়ে এসেছে। এবং হয়ত কালিদাসের ভাগ্যও একেবারে মরুভূমি ছিল না। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠীরা, এমনকি স্বয়ং নগরপালও হয়ত, কোন-না-কোনদিন তাঁর পিঠ চাপড়ে বলে বসেন, 'লেগে থাকো ছোকরা, চর্চা ছেড়ো না।...ভালো হোক মন্দ হোক লেখার অভ্যাস রেখে যাও। চালিয়ে যাও, আমি বলছি।...ক্রমে ক্রমে নাম হবে, খ্যাতি ছড়াবে। কালেক্কে একদিন তুমিও নামজাদা হবে। ব্যাস বাল্মীকির মত না হোক, তাহলেও তুমিও একটা হবে একদিন। কিন্তু

আশ্চর্য নয়।'

এমন উৎসাহলাভ তো আমাদের বরাতেও ঘটে থাকে। আমাদের এলাকার দারোগা, অতদূর না হোক, একজন ডাকপিয়ন সেদিন আমার একখানি প্রচুর সুখ্যাতি করে গেলেন। দুঃখের বিষয় বইখানি আমার লেখা নয়। কার লেখা, তাও জানি না। এবং চপ কাটলেট খাওয়ালে আমাদের বন্ধুরাই বা কোন আমাদের লেখাকে এমন খারাপ বলবে? তা মনে মনে যতই শত্রুতা থাক না? কিন্তু সে কথা তো নয়। কাছাকাছি প্রশংসামাত্রই স্বার্থপ্রণোদিত কিম্বা অর্থ-হীন। একেবারে অর্থহীন হয়ত নয়, বরং বেশ খরচান্তকর, তবে কিনা তার কোন মানে হয় না। অজানার অচেনার এবং সুদূরের সার্টিফিকেটেরই যা দাম।

'আমি সুদূরের পিয়াসী'! সাধে কি গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ? 'কক্ষে তার রুদ্ধ দুয়ার' তথাপি সব কিছু পাসরি কবি সুদূরের অভিলাষী হয়েছিলেন। কিন্তু আজ আর কোনো লেখককে সুদূর পিয়াসার চরিতার্থতায় কক্ষচ্যুত হতে হয় না, সুদূর-পরাহতই চিঠির ছদ্মবেশে উল্কাবেগে ছুটে এসে অদূরে পরাহত হয়।

এই সুবিধা সেকালের কালিদাস ভবভূতির ছিল না, আমাদের আছে। ডাকঘর কল্পতরুর প্রসাদে নবনব পত্রোদ্গমের এই সুবিধার। এই চিঠি পাওয়া পাওয়ি নিয়ে লেখকদের মধ্যে কি কম রেষারেষি হয় নাকি? কোনো সাহিত্যিক বৈঠকে দুজন লেখকের প্রথম আলাপ হয়ত এই ভাবেই হ'য়ে থাকে।

'ওঃ কী চিঠিই আসছে যে আজকাল। পাঠক পাঠিকাদের প্রশংসার জ্বালায় তো গেলাম ভাই! কখন যে অত-অত চিঠির জবাব দেব ভেবেই পাইনে, আমার নাবার খাবার ফুরসুৎটুকুও নেই। কী করি বলতো? আমার হয়ে গুছিয়ে জবাবগুলো দিয়ে দিতে পারে এমন একজন কাজের লোক কাউকে দিতে পার আমায়? এই পার্সোনাল অ্যাসিসট্যান্ট কি, সেক্রেটারী গোছের?'

'দুঃখের কথা আর বোলো না ভায়া।' দ্বিতীয় জন জবাব দিয়েছেন, 'দুজন সেক্রেটারী ছিল আমার কেবল এই কর্মের জন্যেই। কিন্তু বস্তা বস্তা চিঠি এলে তাদের অবস্থা কেমন হয়, বারেক ভেবে দ্যাখ। তাদের আর কি দোষ? আমার কপালের দোষ। সকালে তারা দুজনেই ভেংগে পড়েছে—'

'ভেগে পড়েছে? কী বললে? চিঠির ভয়ে ভেগেছে নাকি?'

'ভাগবে কেন হে? কী বললাম আমি। গ আর ঙ-র তফাৎ বোঝ না—কী রকম লেখক? ক খ গ—তার পরে ঘ পেরিয়ে ঙ না? তাও তুমি জানো না? আমি বললাম ভেঙে পড়েছে...।'

'চিঠির ভারে ভেঙে পড়েছে? উষ্ট্রের পৃষ্ঠে সেই শেষ কুটোটির মতই? বড় দুঃখের কথা তো। যাক, পালায়নি তো? সেই রক্ষে!'

না, না পালাবে কোথায়? চিঠির ভয়ে নয় চিঠির ভারে কোলাপ্স করেছে। সেই কথাই তো বলছি। দুজনেই তারা এখন হাসপাতালে, আইস ব্যাগ মাথায় দিয়ে শয্যাশায়ী। চিঠি তো আকচারই পাই, কিন্তু এত বেশী চিঠি কখনো এর

আগে পাইনি ভাই। কেন এত পাচ্ছি বলতে পারো?'

প্রথম জন প্রশ্নটা একটু ভড়কে গেলেও সামলে নিয়েছেন। এবং বেশ উষ্ণ হয়েই এবার তিনি বলেছেন : 'বটে? গত সপ্তাহে তুমি কতগুলি চিঠি পেয়েছিলে শুনি একবার?'

'তুমি কতগুলি?'

'আমি আগে জিজ্ঞেস করেছি।' প্রাথমিক লেখক বলেছেন—'আগে তার জবাব দাও।'

এবং তারপর আর কোন জবাব নয় পরস্পরকে তাঁরা জবাব দিয়েছেন হয়ত বা জন্মের মতই। যারা লেখকদের উৎসাহিত করবার অভিপ্রায়ে চিঠি দেন, তাঁরা সম্ভবত জানেন না যে ঐ চিঠি দিয়েই আড়াআড়ি করতে গিয়ে কত সুহৃদের চিরদিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যায়। ভগবান, তুমি এই চিঠিদাতাদের মার্জনা কোরো, তারা জানে না, তারা কি করে—চিঠি দিয়ে অজ্ঞাতসারে কোন সর্বনাশ তারা করে বসে, তারা জানে না।

তবে আমিও কি কারো চিঠি পাইনে? পাই বই কি। কখনো যে, পাইনি, তা বলা যায় না! অল্প বিস্তর পেয়ে থাকি আমিও। সত্যি বললে বলতে হয়, অল্পের দিকটা একেবারে অত্যল্প নয়, মানে শূন্য নয় একেবারে, আর বিস্তরের দিকেও তেমনি খুব বেশী বিস্তার নেই। প্রায় মাঝামাঝি। আমার বই যারা পড়ে তারা নিতান্তই পাঠক, লেখার তারা কোন ধার ধারে না, এইরূপ আমার ধারণা। হয় তারা চিঠিপত্র লিখতে ভালবাসে না, অধিক লেখা বাহুল্য মনে করে, কিম্বা লিখলে, পত্রলেখক না হয়ে একেবারে পত্রিকার লেখক হ'তে চায়, নয় তো লেখার তেমন কোন সুযোগ তাদের নেই।

প্রথমত : মন খারাপ হলে লোকে আমার বই নিয়ে পড়ে, এই রকম শুনেছি। তখন কি চিঠি লিখতে মন চায়? তারপর জেলখানার কয়েদিরা আমার লেখা পড়তে ভালবাসে, কিন্তু তাদের চিঠিপত্র লেখবার সুযোগ কম। পকেটমাররাও নাকি আমার বই প'ড়ে বলে শুনে থাকি। আমার লেখা পড়ে পড়ে তারা নাকি চৌকস হয়। নিত্য কর্মে বেরুনোর আগে কাঁচির সঙ্গে শিব্রাম চক্করবরতির একখানা বই নিয়ে তারা বেরোয়। যেদিন এর অন্যথা করে, সেদিন হয় তারা কারো পকেট ধরতে পারে না, নয় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। আবার এও শোনা গেছে, পাশ করা ছেলেরা আমার বই পড়ার জন্যই ফেল করে ফেলেছে। তারপরে ফেল করার দুঃখ ভুলতে আবার তাদের আমার বই পড়তে হয়েছে। এবং তারপরে তার ফলে আবার পুনঃ পুনঃ যাকে ইংরাজীতে পাপচক্র না পাকচক্র কী বলে থাকে! কিন্তু এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না। একাধারে শক্তিশেল এবং বিশল্যকরণী এতদূর ক্ষমতা আমার বইয়ের আছে আমি বিশ্বাস করিনে। এমন কি, যে সব ছেলেমেয়েরা আমার বই পড়ে, আমার বই ছাড়া কিছুই পড়ে না, তারা কিছু না পড়েই পাশ করতে পারে; এই জনশ্রুতিও নিতান্ত অলীক এবং অবিশ্বাস্য।

হ্যাঁ, চিঠি পাবার যে কথা বলছিলাম। আমিও চিঠি পেয়ে থাকি—নিতান্ত কম নয়। একের পিঠে অনেকগুলি শূন্য যোগ করলেই তার সংখ্যা পাবে। শূন্যগুলি এখনও শূন্য রয়ে গেছে এই যা দুঃখ, আপাততঃ আমি একখানাই পেয়েছি। এতদিনে সেই একখানাও যে আমার কোনো গুণমুগ্ধ পাঠিকার হয়ত সেকথা হলফ করে বলা যায় না।

চিঠিখানি 'শিবরাম চক্রবর্তী—কলকাতা' এইরূপ বিরাট ঠিকানা বহন করে এসেছিল। তবু যে এসে পৌঁছেছিল, এর মূলে আমার খ্যাতি কি ডাক-ঘরের কেরামতি কী আছে তা আমি বলতে পারব না। আমার মনে হয় এই কৃতিত্ব আমার অকৃত্রিম বন্ধু সেই ডাকপিয়নের, তারই অসামান্য কীর্তি।

যাই হোক, নাগা পাহাড় থেকে আসা সেই চিঠিখানি এইরূপ, 'মাই ডিয়ার চক্রবর্তীবাবু,

মনিপুরের ইস্কুলে পড়তে একটি বাঙালী মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব হ'য়েছিল। তার মুখে আপনার কথা শুনেছিলাম। আপনার ভাষায় নাকি ভারি অলঙ্কার সে বলত। আমরা নাগা মেয়েরা সাধারণত আমাদের জাতীয় গয়না পরি কিন্তু তা পরতে আমার ইচ্ছে করে না। সেগুলো পরা ভারী কষ্টদায়ক। আমার বাবা, তিনি এখানকার নাগাদের সর্দার, বলেছেন আমার সেই বাঙালী বন্ধুর মত অলঙ্কার আমাকে কিনে দেবেন। অতএব আপনি অনুগ্রহ করে যত শীঘ্র পারেন আপনার সমস্ত অলঙ্কারের একখানা তালিকা আমাকে পাঠিয়ে সুখী করবেন। অলঙ্কারগুলির দামও জানাবেন দয়া করে। ক্যাটালগটা ভি-পি করে পাঠালে ভাল হয়। ইতি—

একান্তভাবে আপনার
'কুমারী 'নিন্ ফ্যাচাঙ।'

ঐ চিঠি পাবার পর অনেকদিন আমার ঘুম হয়নি। ওর কী জবাব হ'তে পারে; কী জবাব দেব, আমি ভেবে পাইনি। এখন অবধি আমাকে, বাধ্য হয়েই নিরুত্তর থাকতে হ'য়েছে।

ভাষাগত আমার যাবতীয় অলঙ্কার (যদি সত্যিই কিছু থাকে) তালিকা-বন্ধ করে পাঠাতে হ'লে আমার পুরো একসেট বই-ই পাঠাতে হয়। বই থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে আটা দিয়ে সেঁটে সেঁটে মেয়েটির গায়ে লাগানো যাবে না যে তা নয়, কিন্তু তেমন অলঙ্কার নাগাদের মুল্লুকেও কতটা জনপ্রিয় হ'বে আমার জানা নেই। দুনিয়ার হালচাল, সেই সঙ্গে ফ্যাশানও, আজকাল এমন উড়ুক্কু বোমার বেগে বদলাচ্ছে যে তার তাল রাখা মুশকিল।

তারপর এই সেদিনের কথা বলি। আমি যে কতদূর বিখ্যাত লেখক এর থেকে পরিচয় পেলাম। তোমরাও সেটা পাও—সেইজন্যেই আমার বলা।

কফি হাউসে সেদিন একলাটি এক টেবিলে বসে আপনমনে কফি পান করছি, এমন সময় একটি অচেনা মেয়ে আমার সামনের কৌচে এসে বসল। সদ্য কলেজে ওঠা কোনো মেয়ে। আমার অচেনা হলেও আমি তার বেশ চেনা;

তার হাবভাব দেখে এই রকমটাই বোধ হলো।

'কী ভাগ্যি আমার। এখানে আপনার দর্শন পাব এ আমি আশা করিনি—' বলল সে।

এর উত্তরে 'আমারো কী ভাগ্যি' এই জাতীয় কোন কথা বলাই বোধ হয় উচিত ছিল, কিন্তু বলব কি? সহসা আক্রান্ত হ'য়ে অপ্রত্যাশিত ধাক্কায় কিছুক্ষণ আমার মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না।

'তা বটে।' বললাম আমি অবশেষে।

'আজ আমার জীবনের কী শুভলগ্ন। আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে তা বলতে পারি না। এক মুখে তা বলা যায় না! আপনার প্রত্যেকটি লেখা আমি মন দিয়ে পড়ে থাকি। তা জানেন?'

'জেনে খুব খুশী হ'লাম। তবে একটা কথা জিজ্ঞেস করি যদি কিছু না মনে কর, তুমি কি পরীক্ষায় ফেল করেছ নাকি?'

'কক্ষণো না। আমি কেন, আমাদের বাড়ির কেউ কখনো কোন পরীক্ষায় ফেল হয়নি! আমি না, আমার দিদিরা নয়, আমার দাদারা নয়—ভাইরাও নয়। আমার দিদি আপনার বই পড়তে কী ভালই যে বাসেন!'

'খুব মনোকষ্ট বুঝি তোমার? সব সময়েই মন খারাপ হয়ে থাকে তাই বুঝি?'

'না না, তা কেন? খুব স্ফূর্তিবাজ মেয়েই তো! আমার দাদাও আপনার লেখার ভারী ভক্ত। তিনি আলীপুরে থাকেন।'

'ও, জেলখানায় বুঝি? বুঝেছি।'

'না, জেলে কেন? সেখানকার এক সরকারী অফিসে তিনি কাজ করেন কিনা।'

'বটে? ভারি আশ্চর্য তো!' আমার নিজেরই আশ্চর্য লাগে এবারে।

'আপনার বই পড়তে বসলে আমাদের আহার নিদ্রা ঘুচে যায়, নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। আর এমন রোমাঞ্চ হতে থাকে কী বলব! আপনার মত ডিটেকটিভ বই আর কেউ লিখতে পারে না—'

'কিন্তু আমি তো ডিটেকটিভ বই লিখিনে—' বাধা দিয়ে বলতে গেলাম। কিন্তু কে শোনে? আমার বাধা অগ্রাহ্য করে মেয়েটি বলেই চলে—'উঃ, আজ কী মজাই না হবে; বাড়ি ফিরে মাকে, দিদিকে আর আমার ভাইদের বলব যে কফি হাউসে কার সঙ্গে আজ এক টেবিলে বসে খেয়েছি জানিস? শুনলে তাদের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠবে! সে আর কেউ না, খোদ আমাদের শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।'

কফি হাউসের ঘটনাটা বলতেই হর্ষবর্ধন হেসে খুন হন—'কী বললেন! আপনাকে হেমেনবাবু বলে ভুল করল মেয়েটি? আশ্চর্য! আপনি যে তাঁর নখের যুগ্যিও নন মশাই! তাঁর মতন গোয়েন্দা কাহিনী লিখতে পারেন আপনি?'

পারি না যে তা মানতে হয়; আমি বলি—'তাঁর কেন, তাঁর কুকুরের নোখের যোগ্যতা আমার নেই। এমন কি, তাঁর বাঘার দন্ত নখরও আমার চাইতে প্রখর।'

আর তারপর থেকেই আমার ভাবনা ধরল। হেমেনদার পাঠক পাঠিকার কাছে কোনোদিন আমি পাত্তা পাব না, জানি আমি; কিন্তু শেষে কি, হর্ষ-বর্ধনেরও হৃদয়কোণের কণাংশ থেকে পাত্তাড়ি গুটোতে হবে আমায়? সেই কারণেই সাত তাড়াতাড়ি এই গোয়েন্দা কাহিনীটি ফাঁদা হয়েছিল সেইকালেই...

আর সেই কালেই প্রায় দুই যুগ আগে রূপাঞ্জলি নামের এক পত্রিকায় এটি অংশত প্রকাশ পায়। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক শেষ করা হয়নি। এতদিন পরে হর্ষবর্ধনের প্রেরণালব্ধ গল্পের সেই চারাটি সম্প্রতি রজনীগন্ধার অর্থবর্ষণে সঞ্জীবিত হয়ে সম্পূর্ণ হল শেষটায়।

দৈনিক বিশ্ববার্তার মফঃস্বল সংস্করণ ছাপা হচ্ছিল তখন। বিরাট মুদ্রা যন্ত্রের গহ্বর থেকে প্রতি মিনিটে পাঁচ হাজার করে কপি উদ্‌গারিত হচ্ছে। কোন আশ্চর্য কৌশলে অতগুলি করে কপি আপনা হতেই এপিঠ ওপিঠ ছাপা হ'য়ে ভাঁজ হয়, থাকে থাকে সজ্জিত হয়ে মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে আসছিল। বাহাদুররাই তা বলতে পারেন।

প্রায় তিন মাইল পরিমাণ কাগজে প্রাত্যহিক বিশ্ববার্তা ছাপা হয়। কাগজ-গুলি পাশাপাশি ছড়িয়ে রাখলে তিনমাইল পরিমিত জায়গা জুড়ে বসবে। কিন্তু আসলে, ওই তিন মাইল কাগজ তিন মাইলের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সারা ভারতবর্ষেই (কত হাজার মাইল কে জানে!) ছড়িয়ে যায়। প্রত্যেকেই আমরা প্রাতঃকালীন চায়ের সঙ্গে বিশ্ববার্তা পড়ি নতুবা চায়ের আস্বাদ পাই না।

বিশ্ববার্তার বাড়িটাও একটা যা-তা নয়। ঠিক তিন মাইল ব্যাপী না হলেও, তিনতলা জুড়ে বড় বড় ত্রিশখানি ঘর ব্যেপে বিস্তারিত কলকাতার কোন এক নামজাদা রাজপথের ওপরেই এর কার্যালয়। এবং বলা বাহুল্য, বিশ্ববার্তার দৌলতেই রাস্তাটার এমন নামডাক।

তুমি যদি বিশ্ববার্তার গহ্বরে কখনো প্রবেশ লাভ কর তাহলে দেখবে, সবাই সেখানে শশব্যস্ত। দেউড়ীর দারোয়ান থেকে শুরু করে ভেতরের কর্মচারীরা, কম্পোজিটাররা, সংবাদদাতারা, বিজ্ঞাপনদাতারা সকলেই সর্বদা ইতস্ততঃ ধাবমান। সদরে-অন্দরে সমান দৌড়-ঝাঁপ। এমন কি, কাগজ ছেপে বেরুতে না বেরুতে হকাররা বগলদাবা করে নিয়ে দৌড় মারছে, তাও তুমি দেখতে পাবে। নিদারুণ কেনবার ইচ্ছে হলেও, তাদের কাউকে দাঁড় করিয়ে এক কপি কিনতে পারবে কিনা সন্দেহ।

উঃ এতলোক কাজ করে বিশ্ববার্তায়। আর এতজন সেখানে যাতায়াত করে কাজে অকাজে। ভাবলে আকুল হতে হয়। ধর, তাদের সবাইকে যদি সার-

বন্দি দাঁড় করিয়ে দেখা যায় (অবশ্য এভাবে দাঁড়াতে তাঁরা সহজে রাজী হ'বেন না) তাহলে সেই লাইন খুব সম্ভব সুন্দরবন ঘুরে আসবে। দুই লাইনে খাড়া করলে তার ডবল জায়গা ঘেরাও হ'তে পারে। আর যদি শোভাযাত্রা করে বার করা যায়, তাহলে ঢাকুরিয়া লেকের মাঝ বরাবর গিয়ে পৌঁছবে। এতদ্দ্বারা অধিকাংশ নাগরিককে জলাঞ্জলি দিতে হয় বলে কলকাতার পুলিশ কমিশনার এই শোভাযাত্রার সম্ভবত অনুমতি দেবেন না। কিন্তু, তা না দিলেও, এতেই ব্যাপারটা কেমন ঘোরালো তা হৃদয়ংগম হ'বে।

এই মুহূর্তে এই বিরাট অট্টালিকায় দারুন হৈচৈ। এই মুহূর্তে নয়—এটা প্রতি মুহূর্তের ব্যাপার। দিনে রাতে কখনো একটু ক্ষণের জন্যও বিশ্ব-বার্তা কার্যালয় চুপচাপ রয়েছে একথা ভাবতে পারা যায় না। তার ঘরে ঘরে কর্ম কোলাহল চললেও একটি ঘর নীরব, নিথর, ঠান্ডা। সেই ঘরটি বিশ্ববার্তার বড় কর্তার ঘর। যাঁর বুদ্ধিবলে এবং কর্মফলে বিশ্ববার্তা আজ বিশ্বের প্রায় সবচেয়ে বড় বার্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে—বিশ্ববার্তার সমস্ত কিছু নির্ভর করছে যাঁর বিরাট স্কন্ধে, সেই থরহরি দত্তর ঘরটিই কেবল চুপচাপ।

সারা বাড়িটিকে, বাড়ির সবাইকে এবং সব কিছুকে কম্পমান করে রাখলেও থরহরি নিজে কিন্তু নিষ্কম্প। শুধু নিষ্কম্প নন, নিবাত নিষ্কম্প। বাত তিনি খুব কমই বলেন, খুব কম লোকের সঙ্গেই বলেন। তাঁর মধ্যে কোন ব্যস্ততা কোন চাঞ্চল্য নেই। তাঁর বিরাট দেহ দেখলে মনে হয় সত্যিই তিনি বিরাট দেহ, এবং মুখভাব দেখলে মনে হয়, তাঁর মাথার ভেতরে যে বিরাট মস্তিষ্ককে তিনি অকাতরে বহন করছেন তা চারটিখানি না। কাজেই, উন্নত লোকেরাও যে তাঁর কাছে এসে সহজেই অবনত হয়ে পড়বে তার আর বিচিত্র কী? তবে তাঁর মুখভাব দেখে তাঁর মনের মধ্যে প্রবেশ করা কারো সাধ্য নয়। বড় কর্তা প্রকান্ড চেয়ারে বসেছিলেন। আর তাঁর টেবিলের চার ধারে কাগজ পত্রের ছড়াছড়ি। তাঁর ঐ টেবিলের ওপর দিয়েই বিশ্বের সমস্ত বার্তা বয়ে চলেছে—যেসব বার্তা সম্পাদকদের সম্পাদিত, মুদ্রাকরদের দ্বারা মুদ্রিত, হকারদের দ্বারা হকৃত হয়ে বিশ্ববার্তারূপে পুনশ্চ আবার প্রবাহিত হবে। কিন্তু চেয়ারের ঐ মানুষটিকে সরিয়ে নাও, দেখবে বিশ্ববার্তা অচল। এমনকি এত বড় আমাদের বিশ্বও অচল বলে তোমার ভ্রম হবে।

এই সময়ে আমাদের গল্পের যবনিকা উন্মোচিত হ'তে দেখা গেল (এর আগে এই যবনিকা উন্মোচনের কোন অর্থ ছিল না) দেখা গেল যে বড় কর্তা কি একটা সংবাদ গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করছেন।

তার বার্তা, বেতার বার্তা কিম্বা টেলিফোন বার্তা নয়, এক টুকরো কাগজে হাতে লেখা একটা খবর। কিন্তু চোখ বুলোতেই চকিতের মধ্যে তিনি সংবাদের মর্ম বুঝতে পেরেছেন বলে বোধ হলো।

'কী সর্বনাশ!' তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

এর চেয়ে বেশী কথা তীব্রতর ভাষা থরহরির কণ্ঠ থেকে কেউ কোনদিন

শোনেনি। এই নিরেট, আত্মনিষ্ঠ, স্বয়ং সৃষ্ট মানুষ এর অধিক বাক্য ব্যয় কদাচই করেছেন। এর চেয়ে বেশী লম্বা এবং বেশী শক্ত কথা তাঁর মুখ থেকে খসলে তাঁর ব্যক্তিত্বের মর্যাদাহানি ঘটত।

'কী সর্বনাশ!' তিনি পুনরুক্তি করলেন: 'কৃত্তিবাস খুন হ'য়েছে! নিজের বাড়ীতে! কী আশ্চর্য, কাল রাতে যে একসঙ্গে আমরা খেলাম গো! আমি তাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি আমার নিজের গাড়ীতে!'

'তুমি যেতে পারো।' সংবাদদাতাকে তিনি বললেন! তারপর টেলিফোনটা হাতে নিয়ে (একটুও চিন্তা না করে তিনি টেলিফোনের চোঙ হাতে নিতে পারতেন; এমনকি চিন্তা করতে করতেও টেলিফোন করার তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল) চোঙটা হাতে নিয়ে, ঠাণ্ডা গলায়, কাটা কাটা কথায়—একটিও কথা বাজে খরচা না করে বলতে শুরু করলেন:

'হ্যালো, অপারেটার! পুট্ মি থ-টু-টু-টু ফোর। হ্যালো। কে? দুই দুই চার? হ্যালো, দুই দুই চার? কান্তিকুমার মিত্রকে আমি চাই। কান্তিই কথা বলছ?.. ওঃ, কান্তি! আমি থরহরি। কাশীপুরে একটা খুন হ'য়েছে এক বাগান বাড়ীতে। কৃত্তিবাস সেনের বাড়ি। কৃত্তিবাস নিজেই নিহত। তুমি সেখানে চলে যাও—চট করে এক্ষুনি। এই খুনের রহস্য তোমাকে উন্মোচন করতে হ'বে। যত টাকা লাগে ব্যয়ের কোনো কার্পণ্য কোরো না। বিশ্ববার্তা তোমার পেছনে রয়েছে। গাড়ী ভাড়া আছে তো তোমার কাছে, বেশ। বেরিয়ে পড় তাহলে।'

রিসিভারের চোঙ যথাস্থানে রেখে তার পর মুহূর্তে বড়কর্তা ঘূর্ণি-চেয়ারের আরেক ধারে ঝুঁকে পড়লেন (এই চল্লিশ ডিগ্রি আন্দাজ) ঝুঁকে পড়ে তার যোগে আরাকানের যে সব বার্তা এসেছিল নিজস্ব এবং পরস্মৈপদী সংবাদদাতাদের দ্বারা প্রেরিত সেই সব সংবাদে মনোযোগ দিলেন। কৃত্তিবাসকে তিনি আর চিন্তায় স্থান দিলেন না।

তাঁর কাজ করার ধারাই এই। বোধ হয় সব বিরাট ব্যক্তিরই ধরণ ধারণ এই রকম।

খুনের কিনারা করা তো ঢের পরের কথা, কিন্তু মৎলব তাই হলেও, আগে তার কিনারায় পৌঁছানো দরকার। লাশের কাছে এবং আশে পাশে অপরাধীর নানান নিশানা সাধারণ দৃষ্টির অগোচরে ছড়ানো থাকা—সন্ধানী নজরের অপেক্ষায়। কান্তি কুমারের গোয়েন্দা সুলভ সেই সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল। কান্তি গোয়েন্দা নয়, কিন্তু অনেক গোয়েন্দার কান কাটে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কান্তি কুমারকে একটা মোটরে উপবিষ্ট হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে কাশীপুরের দিকে ছুটতে দেখা গেল। গ্রে স্ট্রীটের মোড় পেরুতে না পেরুতেই তার কানে গেল, হকাররা হাঁকছে: 'কাউন্সিলার খুন! বিশ্ববার্তা টেলিগ্রাম পড়ুন বাবু! আরেকজন কাউন্সিলার খুন!'

গাড়ী থামিয়ে দশ পয়সা ফেলে দিয়ে এক পাতার একখানা টেলিগ্রাম

কান্তিকুমার কিনেছে। গাড়িতে বসেই দুর্ঘটনাটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়েছে একবার।

কৃত্তিবাস সেন নামজাদা একজন কাউন্সিলার। তাঁর গঙ্গা তীরবর্তী বাড়িতে কে বা কারা তাঁকে খুন করে রেখে গেছে। যেসব লক্ষণ দেখা যায়, তাতে খুন বলেই সন্দেহ হয়—এমনকি লক্ষণগুলির প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা খুঁটিয়ে দেখালেও খুন ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। কর্পোরেশনের এই হতভাগ্য কাউন্সিলার মৃত্যুকালে বেশভূষায় সুসজ্জিত ছিলেন—দেখলে বেশ ধারণা হয় মৃত্যুর জন্য আদৌ তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। একটু আগে যে তিনি বিলিয়ার্ড খেলেছেন, এরূপ ধারণা করাও খুব কঠিন নয়। বিলিয়ার্ড রুমে চিৎপাৎ অবস্থায় তাঁকে পাওয়া গেছে—তাঁর একটা পা বিলিয়ার্ড টেবিলের এক পায়ায় ঠেকানো। একটা চটকদার কাপড়ের টুকরো যদ্দুর মনে হয় তাঁরই নিজের রুমাল, তাঁর গলায় পাক দিয়ে জড়ানো—সেই রুমালের সঙ্গে আটকানো আবার বিলিয়ার্ড কিউ। তাঁর সারা মুখে প্রশান্ত হাসি। অদ্ভুত এক প্রসন্নতা, আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় শ্বাসরুদ্ধ হয়েই তাঁর জীবন অবসান ঘটেছে। তাঁর দেহে দুটি গুলির গুর্তও দেখা যায়, প্রত্যেক দিকে একটি করে দেহের ভিতর দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে পিস্তলের গুলিটা বেরিয়ে গেছে মনে হয়। তার ওপরে আবার পিঠের শিরদাঁড়া ভাঙা। তাঁর হাতদুটি স্বামী বিবেকানন্দের স্টাইলে বুকের ওপর বিন্যস্ত। এক হাতের মুঠোয় এখন পর্যন্ত বিলিয়ার্ডের একটা বল ধরা। ঘরের মধ্যে ধস্তাধস্তি মারামারির কোন চিহ্ন নাই—যাবতীয় আসবাবপত্র যে যার যথাস্থানে—কোথাও একটুকু বিশৃঙ্খলা ঘটেনি। কেবল পরিধেয় বস্ত্র থেকে চৌকা একটা ফালি অন্তর্হিত হ'য়েছে।

বিশ্ববার্তার সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই খুনের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। পত্রিকা বলছে, এই নিয়ে দুই সপ্তাহের মধ্যে তিনটে কাউন্সিলার মারা পড়ল। এইভাবে কাউন্সিলার মারা পড়লে এই জাতি, মানে এই কাউন্সিলার জাতি কতদিন টেঁকসই হবে? অহেতুক কোনরূপ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা তাঁদের অভিপ্রায় নয় ঃ কিন্তু তা না হলেও, তাঁদের মতে এই কাউন্সিলার হানির আশু অবসান ঘটা উচিত। প্রত্যেক জিনিষেরই একটা সীমা আছে, যুক্তিসঙ্গত সীমা। এমনকি, কাউন্সিলার মতকেও। খামোখা কেন এক একজন কাউন্সিলার খুন হতে থাকবে?

অবশ্যি প্রশ্ন উঠতে পারে, কাউন্সিলারদের বেঁচে থাকারই বা কি দরকার? তাঁদের বেঁচে থেকে, বাঁচিয়ে রেখেই বা লাভ কি? কিন্তু এ প্রশ্নের কোন মানে হয় না। তাঁরা বেঁচে থাকে। বেঁচে বর্তে থাকতে দেখা যায় তাদের অত্যন্ত স্বভাবতই। এমনকি, সবদিক বিবেচনা করে দেখলে দেখা যাবে, জনসাধারণের কাছে, সমাজের কাছে, কাউন্সিলারদের দাবি এমন কিছু বেশী নয়। এমন কিছু বেশী তারা চায় না যেজন্য তাদের এভাবে অপসারণ করা আবশ্যক। কী চায় তারা? মাঝে মাঝে একটু তোয়াজ, কখনো ঘুষ, এবং সময়ে অসময়ে

ভেট। ব্যস, এর বেশী কিছু নয়। এর জন্যেই কি তাঁদের ধরে ধরে খুন করতে হবে? এইভাবে কাউন্সিলার খতমের দ্বারা কলকাতায় যে লাভ হয় তা কি কর্পোরেশনের ক্ষতির তুলনায় ওজনে কিছু ভারি? সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে?

হত্যাকাণ্ডটির চুলচেরা খতিয়ে বিশেষ সংস্করণে বিশ্ববার্তার সম্পাদক এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে. এই ধারায় কাউন্সিলার বিয়োগ হ'তে থাকলে আর এক জেনারেশনের (কিম্বা ডিজেনারেশনের) মধ্যে আর একজন কাউন্সিলারেরও অস্তিত্ব থাকবে না। মিসিংলিঙ্কের মত এরাও লোপ পাবে। এই জীবদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কি আমাদের সকলেরই সমবেতভাবে তৎপর হওয়া উচিত নয়—এই প্রশ্নে তাঁর সম্পাদকীয় বক্তব্যের তিনি উপসংহার করেছেন।

কান্তিকুমার মিত্র গোয়েন্দা নয়. আগেই বলেছি। কান্তিকুমার রিপোর্টার। বিশ্ববার্তার নিজস্ব বিশেষ সংবাদদাতাদের মধ্যে তিনি বিশেষত্ব। বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পাঠদ্দশা সাঙ্গ করে বিশ্ববার্তার কার্যালয়ে তিনি চাকরি নিয়েছেন এই দু'মাস। কিন্তু দু'মাসের মধ্যেই তিনি উন্নতির চূড়া থেকে চূড়ান্তরে উঠেছেন। কাজ নেওয়ার প্রথম সপ্তাহেই তিনি এক গুরুতর সমস্যা ভেদ করেন ঃ পাটের বাজার থেকে পাট লোপাট হওয়ার সমস্যা। দ্বিতীয় সপ্তাহে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের কেলেঙ্কারি তিনি প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় সপ্তাহে এই শহরের কতিপয় গণ্যমান্য নাগরিকের কুকীর্তি তিনি লোকচক্ষে অনাবৃত করেন। তারপর থেকে. জটিল কুটিল যেখানে যা সমস্যামূলক হয়ে রহস্য ভেদের অপেক্ষায় আছে, সে সমস্ত ভার বিশ্ববার্তার দপ্তর থেকে তাঁর ঘাড়েই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব এই খুনের কিনারা করার হেতু বিশ্ববার্তার বড় কর্তা ধরহরিবাবু যে কান্তিকুমারের স্কন্ধে নির্ভর করবেন তাতে আর আশ্চর্য কী?

কান্তিকুমার অচিরেই খুনের কিনারায় এসে পেঁছিলেন। গঙ্গার গা ঘেঁসেই প্রকাণ্ড ইমারত—বড় রাস্তার ওপরেই। এধারে রাস্তা ওধারে গঙ্গা। কান্তি-কুমার দেখল পুলিশ চারধার ঘেরাও করে ফেলেছে। সেই ঘেরাওয়ের এখানে ওখানে ইতস্ততঃ অলস কৌতূহলীর দল জোড়ে বিজোড়ে দু'পাঁচ সাতজনে জড়ো হ'য়ে জটলা পাকাচ্ছে, আর গুলতানি করছে। চারধারেই পাহারাওলা। তাদের মুখের চেহারায় যেন এই প্রশ্ন দেগে দেওয়া—অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি. এরপর আরও না জানি কি আছে। এইরূপ যেন একটা হতভম্ব ভাব—যা কেবল পুলিশের মুখেই দেখা যায়। সাধারণ পাহারাওলার মধ্যে পুলিশ কর্মচারীরও অভাব ছিল না। তাঁদের একজন বলছিলেন. 'এই ব্যাপারের পিছনে নিশ্চয়ই একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে, কিন্তু তা যে কী, আমি আন্দাজ করতে পারছিনে।' অপর ব্যক্তির জবাব শোনা গেল, 'আমিও ভাই তাই অঁথৈবচ।'

থানার বড় দারোগা. তাঁর চেহারাখানাও বেশ বড়! লম্বা-চওড়া রাজসংস্করণ

চেহারা চোখে-মুখে কোটালসুলভ কৌটিল্য। সাধারণত, বড় দারোগাদের মধ্যে যেমনটি দেখা যায়। এই লোকটিই কি সেই লোক যাঁর ঘোষণা আমরা যেখানে সেখানে যখন তখন দেখেছি শহর আর শহরতলীর আনাচে কানাচে যাঁর সজাগ দৃষ্টি সর্বদা পাহারা দিচ্ছে? সে সতর্ক দৃষ্টি ঠগী আর বদমাইসদের হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে দ্বিধাবোধ করছে না—অবশ্যই আমরা মারা যাবার পরেই। না, বোধহয় তিনি নন।

বাড়ির সামনের একটা সরকারী ল্যাম্প পোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, কান্তিকুমারকে দেখে তিনি গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়লেন।

'কী আক্কেল গুড়ুম নাকি আদ্যনাথ?' কান্তিকুমার জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, কান্তি আবার আমার আক্কেল গুড়ুম।' জবাব দিলেন বড় দারোগা ওরফে আদ্যনাথ। তাঁর কণ্ঠস্বর করুণ বলে বোধ হল। 'আমার ধারণা ছিল এটার আমি কিনারা করতে পারব! কিন্তু এবারও আমি কোন কূল পাচ্ছি না।'

আদ্যনাথ রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছবার ছলনায় চোখের কোণদুটো মুছে নিলেন।

'এই নাও, সিগ্রেট,' বলল কান্তি : 'এখন বলতো ব্যাপারখানা কী? শুনি আগাগোড়া। রহস্যটা কোথায় দুর্ভেদ্য হয়েছে দেখা যাক খতিয়ে!'

সিগ্রেট পেয়ে আদ্যনাথবাবুর চেহারা আরো উজ্জ্বল বোধ হল। চোর ছেঁচড়রা যেমন ঘুষি পেলেই খুশি হয়, পুলিশের লোকেরা তেমনি কোন-না-কোনপ্রকারে ঘুষ না পেলে তুষ্ট নন। এদিক দিয়ে তাঁরা প্রায় দেবতার সগোত্র, এইরূপ শোনা যায়।

সিগ্রেট উপহার লাভে আদ্যনাথের উৎসাহ দেখা দিল। 'বলছি সব!' বললেন তিনি : 'দাঁড়াও, বাজে লোকগুলোকে আগে বিদেয় করে আসি।'

এই বলে একজন পাহারাদারের কাছ থেকে মোটা একটা লাঠি কেড়ে নিয়ে কৌতূহলী জনতাকে তিনি তেড়ে গেলেন। তার সেই তাড়নায় দুইয়ে দুয়ে তিনে তিনে, জোড়ে বিজোড়ে ইতস্তত যেসব জনতা জমেছিল বাত্যাতাড়িত জঞ্জালের মত ইতোনষ্ট হয়ে স্ততোভ্রষ্ট হয়ে পড়ল। পড়বে কেন? কথায় বলে খুন খারাপী। খুনের সঙ্গে সঙ্গে খারাপীরা লেগে থাকে।

ওসব খারাপ লোকেদের ছেড়ে দাও। বলল কান্তিকুমার: এখন কাজের কথা বল। পদচিহ্নের খবর কি?'

কান্তি সটান কাজের কথায় পড়তে চায়: 'পায়ের দাগ পাওয়া যায়নি? নাকি সেদিকে এখনও দৃষ্টি দেওয়ার ফুরসৎ হয়নি তোমার?'

'দিয়েছি!' জানালেন আদ্যনাথ : 'সব প্রথমেই পায়ের দাগে আমার লক্ষ্য ছিল, সারা বাগানটাই পায়ের দাগে ভর্তি। এই যেমন দ্যাখো না—এই এক ধরণের পদচিহ্ন। একদম কাঠের পা।'

চাঁচাছোলা ঘাসালো জমির ওপর বিন্যস্ত একজাতীয় বিশেষ দাগের প্রতি কান্তিকুমারের দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করলেন।

'এই দাগগুলো দ্যাখো। সহজে কি আমি দাগা পেয়েছি হে। এমনি আমার আক্কেল গুড়ুম।'

কান্তিকুমার দেখল।

'এই লোকটার একটা পা বেমালুম কাঠ। এই কাঠের পাখাওয়ালা লোকটা'—বলতে লাগলেন আদ্যনাথঃ 'বন্দরে মনে হয় কোন জাহাজের খালাসী। দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা বলেই মনে হয়। এডেন থেকে আসছে এখন। অল্পদিন হ'ল করাচীতে এসেছে। করাচী থেকে ট্রেনে এসেছে কলকাতায়। পায়ের দাগ দেখলেই এ সমস্ত স্পষ্ট বোঝা যায়।'

কান্তিকুমার ঘাড় নাড়লঃ 'ঠিক'।

'আরো বোঝা যায়' বোঝাতে লাগলেন আদ্যনাথ ঃ 'যে, এই লোকটার ডান হাতে একটা ছড়ি ছিল আর কোমরে ঘুনসিতে বাঁধা ছিল ছোট্ট একটা হুইশিল।'

'তা বেশ দেখতে পাচ্ছি।' কান্তিকুমার ভাবিত মুখে বলল, 'এই হুইশিলটা ছিল আবার ডানদিকে বাঁধা। এই কারণেই ডানদিকে লোকটা একটু ঝুঁকে পড়েছে তাও বোঝা যাচ্ছে।' বোঝাটাকে কান্তি আরো একটু ভারি করে দেয়।

'তোমার কি মনে হয়, কান্তি, এই কেঠো পা খালাসীটাই এডেন থেকে এসে ওই খুন করেছে?' আদ্যনাথ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন—'সেই কি করতে পারে—তোমার ধারণা?'

'খুব পারে।' কান্তি বলে ঃ 'এইসব খালাসীরাই তো এইসব কান্ড করে থাকে। খুন করতে পেলে তারা আর কিছু চায় না। জাহাজ থেকে নেমেই তারা খুন করে। লাস, আর খালাসীর মধ্যে কেমন একটা জড়াজড়ি ভাব রয়েছে দেখছ না?'

বড় দারোগা ঘাড় নাড়লেন ঃ 'এবার এই দাগগুলো দ্যাখো ঃ মনে হয় যেন কোন কাবুলীওয়ালার! সুদের তাগাদায় যাতায়াত করা পা—দেখলেই বোঝা যায়। ঘাতকের অপেক্ষায় ওৎ পেতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা একনিষ্ঠ পা। এখানে সেখানে নড়েচড়ে দাঁড়ালেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেছে—এ পায়ের দাগগুলো দেখলে তাই কি মনে হয় না? দ্যাখো না, কি রকম মাটির মধ্যে বসে গেছে গভীর হ'য়ে--'

'হ্যাঁ,—দেখছি।' কান্তি মাথা নাড়ে ঃ 'এ লোকটাও খুন করতে পারে বটে।'

'এইরকম আরো কত পায়ের দাগ!' আদ্যনাথ বিবৃতি দেন ঃ 'আরো কত রকমের—কিন্তু সে সব কোন কাজের নয়। বেশীরভাগ ঐসব অকর্মাদের।' এই বলে কৌতূহলী জনতার দিকে আদ্যনাথ ভ্রূভঙ্গী করেন ঃ 'বাগান বাড়ীটা আমরা এসে ঘেরাও করে ফেলার আগেই ওরা জায়গাটা চষছিল কিনা।'

'একটু থামো।' কান্তিকুমার কি যেন ভেবে নেওয়ার চেষ্টা করে, 'আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যায়নি?'

'আঙ্গুলের ছাপ?' আদ্যনাথ হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়েন, 'আঙ্গুলের ছাপের কথা আর বলো না। সারা বাড়িটাই আঙ্গুলের ছাপে ভর্তি।'

'তার মধ্যে বর্মীর আঙ্গুলের দাগ হ'তে পারে এমন কিছু পেয়েছ?' কান্তিকুমার উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করে।

'বর্মীর আঙ্গুলের দাগ তিন রকমের পেয়েছি।' আদ্যনাথের মুখ আরো গম্ভীর হয়; 'কিন্তু সে সব কোন কাজের নয়।'

কান্তি আবার বিচক্ষণের মত মাথা দোলায়।

কিন্তু দারোগা সাহেব; কান্তি নতুন সমস্যা নিয়ে আসে : 'রহস্যময়ী নারীদের কী খবর? তাদের কাউকে কি দেখতে পাওনি এখানে এসে!'

'রহস্যময়ী নারী? দেখেছি। সকাল থেকেই চারজন গেছে এ পর্যন্ত।' আদ্যনাথ বাৎলান: একজন গেছে সকাল সাড়ে সাতটায় একজন সোয়া ন'টায়। 'বিষন্ন সুরে অনুযোগ করেন : আমার মতে তারা প্রত্যেকেই রহস্যময়। সব মেয়েই আমার কাছে রহস্যময়ী বলে মনে হয়।'

আচ্ছা, এইবার অন্য দিক থেকে আরম্ভ করা যাক,' কান্তি বলে : 'সমস্ত জিনিসটা নতুন করে গড়বার চেষ্টা করা যাক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে। যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে রহস্যের পার পেতে হ'বে—এই খুনের কিনারায় পৌঁছতে হবে।...ভাল কথা, কৃত্তিবাস সেন তো আইবুড়ো ছিলেন তাই না?'

আইবুড়োই বটে, বে থা করেন নি, এবং বুড়ো হ'তে চলেছিলেন, এতবড় বাগানবাড়িতে একলাই থাকতেন তিনি।' আদ্যনাথ জানান।

'ভাল কথা। তা হ'লে নিশ্চয়ই তাঁর এক পেয়ারের খানসামা ছিল তো? তা না থাকলে তাঁকে দেখত শুনত কে? এবং সেই প্রিয় ভৃত্যটি নিশ্চয় তাঁর অতিশয় বিশ্বাসী আর পুরাতন—এবং বিশ বছর ধরে এক নাগাড়ে কাজ করছিল তাঁর কাছে?'

আদ্যনাথ সায় দিলেন মাথা নেড়ে।

'তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বোধ হয়,' জিজ্ঞেস করল কান্তি।

'সবার আগে। চাকরদের আমরা কখনও ছাড়ি না—ছেড়ে কথা বলি না। বিশ্বাসী পুরানো চাকর হ'লে তো কথাই নেই, এবং তারাও ঠিক তাই-ই প্রত্যাশা করে। বলব কি কান্তি, এই চাকরটার নাম উদ্ধব। আমরা আসা মাত্রই আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করল, পালাতে পারত, কিন্তু পালায় নি। গ্রেপ্তার হবার জন্যই অপেক্ষা করছিল বোধ হয়।'

'ঠিক হয়েছে।' কান্তি বলল; তারপর দেখা যাক। ঐ চাকর ছাড়া আর কে কে ছিল বাড়িতে? কোন ঠাকুমা-দিদিমা স্থানীয়, কোন বুড়ি ঝি, দাই-মা গোছের—যে শিশু অবস্থা থেকে কৃত্তিবাসকে মানুষ করে তুলেছে? একেবারে বন্ধ কালা এ-রকম কোন মেয়েছেলে পাওয়া যায় নি বাড়িতে?'

'একেবারে হুবহু।'

'তার মানে?'

'ঠিক ওই রকমের এক বুড়ি ঝি—দাই-মা গোছের—যে কৃত্তিবাসের শৈশব থেকে—'

'বুঝেছি আর বলতে হবে না। তা সেই মেয়েটি কি এতবড় এই হত্যাকাণ্ডের সময়ে কোন কিছু শুনতে পায়নি? কোন অস্বাভাবিক আওয়াজ? ধস্তাধস্তির শব্দ—বা'?

'টু' শব্দটিও না। তবে খুব সম্ভব, এটা তার বধির কালামির জন্যই বোধহয়।'

'হ্যাঁ, তাও হতে পারে।' কান্তি ঘাড় নাড়ল। 'আচ্ছা ও ছাড়াও এই বাড়ির পেছনে নিশ্চয় আস্তাবল আছে, সেখানে সহিস আর কোচম্যান বাস করে ঘোড়াদের সংগে? একবার মোটর দুর্ঘটনা হবার পর মোটরের পাট তুলে দিয়ে কৃত্তিবাস সেন আজকাল ঘোড়ার গাড়ির চর্চা করছেন—তাঁর সেই ফিটন গাড়ির সহিস, কোচম্যানরা কোথায়?'

'কোচম্যান এই খুনের রাত্রে সহিসকে নিয়ে কোন এক সিনেমায় হোল নাইট শো দেখতে গেছল বাবুর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে। ফিরেছে আজ সকালে। আমার এখানে আসার পরে, কান্তি, ওদিকে সন্দেহ করার কিছু নেই—ওসব আমরা খুঁটিয়ে দেখেছি।'

'ওরা ক'জন ছাড়া আর কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিনী ছিল না, যে এই বাড়ীর সংগে বা এই কৃত্তিবাসের সংগে কোন-না-কোন প্রকারে বিজড়িত?'

'হ্যাঁ, ছিল। ছিল কেন, আছে। কৃত্তিবাস সেনের লেডি টাইপিস্ট অলকা দত্ত। কিন্তু সে আসে সকালের দিকে—কর্পোরেশন ও কৃত্তিবাসের আপিস সংক্রান্ত কাজকর্মের ব্যাপারে; রাত্রির কাণ্ড সে কিছু জানে না।'

'তুমি কি এই মেয়েটিকে দেখেছ?' কান্তির সাগ্রহ প্রশ্নঃ 'মেয়েটি দেখতে কেমন?'

'দেখেছি, দেখবার মত!' জানালেন আদ্যনাথ ঃ 'দেখতে মন্দ নয়, খুশীই বলতে হয়।'

'এবার এই মেয়েটির পালা। এবার এ বিপদে পড়বে, চাই কি মারা পড়াও বিচিত্র নয়। একে ঘিরেই হত্যাকারীরা চক্রান্ত করবে এবার স্পষ্ট আমি দেখতে পাচ্ছি।' দেখতে দেখতে কান্তিকুমার ভাবিত হয়ে পড়ে।

'কী করে বুঝলে?' আদ্যনাথ বিস্মিত হয়। 'খুন হবার মত কোন কারণ মেয়েটির কোথাও নেই কিন্তু।'

'সেইজন্যই তো খুন হবে। কৃত্তিবাসের মধ্যে তেমন কোন কারণ ছিল নাকি?' সত্যি বলতে, এই কৃত্তিবাসই কিন্তু রামায়ণ লেখেনি—রামায়ণের জন্য দায়ী নয়। তবু খুন হ'ল। এ মেয়েটির তেমন কোন দায় না থাকলেও হত্যাকারীরা একে আদায় করতে পারে। কেন, ছাড়বে কেন?'

আদ্যনাথ জবাব দিতে পারেন না! কেবল দাড়ি চুলকোন।

'কিন্তু যতই তারা চেষ্টা করুক, তারা ব্যর্থ হবে। বিপর্যস্ত হবে। হবেই। আমিই তাদের বিপর্যস্ত করব। তাদের কুকর্মে বাধা দেব, তাদের চক্রান্তজাল ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলবো। এই মেয়েটিকে আমি বাঁচাব, বুঝেচ আদ্যনাথ?'

'তা, তুমি বাঁচাতে পারো বটে। অনায়াসেই পারো।' আদ্যোপান্ত খতিয়ে গোঁফ চুলকে বললেন আদ্যনাথ : 'বাঁচাবার কোনই বাধা নেই। কারণ, মেয়েটি বেঁচেই আছে। এবং থাকবেও আশাকরি।'

'কিন্তু ঐ চক্রান্তজাল? যা তার চারদিকে বিস্তৃত হয়েছে?'

'মেয়েদের চক্রে এসে পড়লে সব চক্রান্তজাল আপনার থেকেই ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যায়, তা কি তোমার জানা নেই কান্তি?'

কান্তি এবার দারোগাকে বললে : 'আমাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে চলুন।'

আদ্যনাথ আগে চলল। অতবড় আর অমন সুসজ্জিত বাড়ির ভেতরে কী অক্ষুন্ন শান্তি! কোথাও যেন এমন কিছু ঘটেনি।

'গোলমালের কোন চিহ্ন দেখছিনে কোনখানে।' বলল কান্তি।

'না।' জবাব দিলেন আদ্যনাথ। 'কোথাও একটু চুলের এদিক ওদিক ঘটেনি। তবে, চুলচেরা ভাব দেখলে তা বড় ঘটেও না। যে লোকটি খুন হয় কেবল সে ছাড়া আর সব কিছুই ঠিকঠাক থাকে। তার নিজের দেহে ছাড়া আর কোথাও কোন বিপর্যয় বড় একটা দেখা যায় না।'

ড্রয়িংরুমের দ্বার মুক্ত করে ভেতরে গেল তারা। ইলাহি ঘর, আশ্চর্য সব আসবাবে সাজানো। 'চেয়ে দেখ, এইখানেও অতবড় বিপর্যয়ের কোন লক্ষণ নেই।' বললেন আদ্যনাথ।

জানলায় পর্দা নামানো, জামা পরানো টেবিল—চেয়ার, চাদর গায়ে দিয়ে পিয়ানো, ত্রিশঙ্কুর মত ঝোঝুল্যমান বিজলি বাতির ঝালর। সব যে যার যথাস্থানে যথাযথ রয়েছে। কোথাও যেন ইতর বিশেষ কিছু ঘটেনি।

'এস ওপরে; বিলিয়ার্ডের ঘরে এস।' আদ্যনাথ বললেন: 'লাস অবশ্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য। কিন্তু আর সবকিছুই ঠিক সেইভাবেই রাখা রয়েছে—একচুল নড়ানো হয়নি।'

তারা দুজনে দোতলায় গেল। সিঁড়ি পেরিয়েই সামনের সেই বিলিয়ার্ড ঘর। প্রকাণ্ড বিলিয়ার্ড টেবিল ঘরের মাঝখানটিতে; কিন্তু কান্তি তার প্রতি দৃক্‌পাৎ না করে সটান জানলার কাছে ছুটে গেল। 'হা-হা-হা।' হাসল সে: 'এখানে কী? কী দেখছি এখানে?'

দারোগার মাথা নাড়ায় কোন উত্তেজনা নেই। তাঁর কণ্ঠস্বর শান্ত। একটু বিচলিত না হ'য়ে তিনি বললেন: 'হ্যাঁ জানলাটা দেখলে মনে হয় বটে যে বাইরে থেকে খোলা হয়েছে। ধারালো কোনো অস্ত্রের সাহায্যে খড়খড়িটা বাইরে থেকে ফাঁক করা হয়েছে বলে মনে হয়। জানলার বাইরে কার্নিশের জমাট ধুলোয় আন্দোলনের চিহ্নও দেখা যায়। মনে হয় অসাধারণ সাহসী কোন লোক তলপেটের ওপর ভর দিয়ে খড়খড়ির ফাঁকে হাত গলিয়ে ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে জানলার ছিটকিনিটা—কিন্তু ও নিয়ে ব্যস্ত হবার কিছু নেই কান্তি-বাবু! বৃথা মাথা ঘামিয়ো না। সব খুনখারাপির ব্যাপারেই ও রকমটা হয়ে

থাকে, প্রত্যেক কেসেই দেখা যায়।'

'সে কথা সত্যি।' কান্তি ঘাড় নেড়ে সায় দিল। এবার সে ঘরে চারিদিকে ইতস্তত তাকাতে লাগল। এবং তার কণ্ঠ থেকে স্বতস্ফূর্ত বিস্ময়ের আরেক উচ্চনাদ উথলে উঠল: 'ওই কুলুঙ্গিটা দেখেছ? পর্দার প্রায় আড়ালে প্রকাণ্ড ওই তাকটা? তাকিয়ে দ্যাখো একবার।'

'বহু আগেই দেখেছি!' আদ্যনাথ জানালেন, 'কুলুঙ্গির জমানো ধুলোর মধ্যে কিছু চিহ্ন দেখা গেছে। ধুলোর স্তর ইতস্তত করা—বেশ নড়ানো চড়ানো। পায়ের দাগের ছাপও অস্পষ্ট দেখা যায়। অসাধারণ ক্ষিপ্র কোন লোকের পক্ষে ঐ তাকের ওপরে লাফিয়ে উঠে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব নয় কিছু।'

'ছাদের কাছটা দেখেছ?' কান্তি এবার নজর উঁচু করে: ছাদের কাছে ঐ ঘুলঘুলিটা? একটু অস্বাভাবিক আকারের নয় কি? কী মনে হয় তোমার? ওখানেও কি একজন—'

'স্বচ্ছন্দে। কড়িকাঠে দড়ি লাগিয়ে দেওয়ালের গা বেয়ে উঠে একজন লোক অনায়াসে ঐ ঘুলঘুলির ফাঁকে শুয়ে থাকতে পারে। অসাধারণ ধূর্ত কোন লোক সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বসবাসের জন্যে ঐ রকম জায়গাই পছন্দ করবে বরং।'

'এক মিনিট। থাম একটু।' কান্তির আবার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে: ঐ ভ্যানিটি ব্যাগের অর্থ কি? ঐ যে ওখানে ঝুলছে।'

আধুনিক কোন মহিলার অতি আধুনিকতার চূড়ান্ত উদাহরণ স্বরূপ চমৎকার একটি ভ্যানিটি ব্যাগ দেওয়ালের গায়ে লাগা একটি আলনার আঁকশিতে লটকানো।

'হ্যাঁ, ওটার কথাও যে ভাবা হয়নি তা নয়।' বললেন আদ্যনাথ। 'ওতে আমরা হাত দিইনি—ওটাকে ওখানেই রেখে দিয়েছি। কেমন যেন আমাদের মনে হয়েছে—ঐখানেই ঐ রহস্যের কিনারা আছে। বিশেষ একটা মতলবেই ওটা অমনি রেখে দেওয়া হয়েছে। যে ঐ ব্যাগটি নিতে আসবে, সে যে এই খুনের সঙ্গে কোন-না-কোনভাবে জড়িত তাতে আর কিছু ভুল নেই। আমাদের ধারণা—'

কিন্তু কান্তি আর উক্ত ধারণায় কর্ণপাত করছিল না। সে তখন বিলিয়ার্ড টেবিলের ধার ঘেঁষে এগিয়ে গেছে।

'দ্যাখো, দ্যাখো!' চিৎকার করে উঠেছে সে; 'এইবার বুঝি রহস্যের একটা কিনারা পাওয়া গেল। বিলিয়ার্ড বলগুলোর পজিশন দ্যাখো। শাদা বলটা টেবিলের ঠিক মাঝখানে আর লাল বলটা টেবিলের শেষ পকেটের একেবারে গায়ে গায়ে। এর কী, আদ্যনাথ, মানে কী এর?'

আদ্যনাথ দারোগাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে কান্তি—আদ্যপ্রান্ত ধরেছে। তার চোখে উদ্বেগ, কণ্ঠে ব্যাকুলতা। ক্ষুরধার দৃষ্টি দিয়ে আদ্যনাথকে

চুরমার করতে চায় যেন সে।

'আমার জানা নেই' আদ্যনাথ জানালেন; 'বিলিয়ার্ড খেলা আমি জানিনে।' এই আকস্মিক জড়াজড়িতে তাঁকে যেন একটু বিভ্রান্তই দেখা গেল।

'আমিও জানিনে।' কান্তি বলল—'কিন্তু আমাকে জানতে হবে এর রহস্য। এক্ষুনিই। এর উপরেই এই হত্যাকাণ্ডের আসল ফয়সালা নির্ভর করছে। কাছাকাছি বইয়ের কোন দোকান নেই নাকি? কিম্বা কোন লাইব্রেরী—ইংরেজী বইয়ের? একটা বিলিয়ার্ডের বই যোগাড় করা দরকার।'

এই বলে আর একমুহূর্ত না দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে কান্তি উধাও হয়ে গেল। দারোগা আদ্যনাথ স্তব্ধ হয়ে চিন্তান্বিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ নিজেকে তাঁর অত্যন্ত রোগা বলে মনে হতে লাগল। 'চলে গেল।' অস্ফুট স্বগতোক্তি বেরুল তাঁর গলা থেকে—তাঁর নিজের চিন্তাধারা ও মতামত নিজেকে বিড়বিড় করে জানানোর এই বিড়ম্বনা তাঁর বহুকালের, তাঁর এই বদ অভ্যাস থেকে মনে হয়, দেয়ালের কান থাকায় তাঁর বিশ্বাস নেই।

আশ্চর্য। থরহরিবাবু কেন ওর ওপরে নজর রাখবার জন্য আমাকে টেলিফোনে জানালেন—? কান্তির গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখবার জন্য প্রত্যহ তিনি পঞ্চাশ টাকা করে দেবেন আমায়, তাও বলেছেন। কিন্তু কেন যে—!

পরমুহূর্তেই তাঁর চিন্তাধারা পালটে গেছে : 'কান্তি বোধহয় বিলিয়ার্ড বইয়ের খোঁজে বেরিয়েছে। ততক্ষণ নিরিবিলি একটু জিরিয়ে নেয়া যাক।'

বলে সামনের কৌচে নিজেকে এলিয়ে দিলেন তিনি— 'কাল সারারাত যা ধকল গেছে! সকালেও একটু চোখ বুজতে পারিনি। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, থরহরিবাবু কান্তিকেও বলেছেন আমার ওপর নজর রাখতে? এই কৃত্তিবাসী রামায়ণে আমাকেও জড়িত বলে হয়ত তিনি সন্দেহ করেন। কে জানে!' আবার এক নতুন বিড়ম্বনা শুরু হয় তাঁর।

ইতিমধ্যে বিশ্ববার্তা কার্যালয়ে থরহরিবাবুর বাড়ি যাবার সময় হ'য়েছে। কাজ সেরে হুক থেকে তিনি কোট পেড়ে নিজের গায়ে চাপাচ্ছেন, এমন সময়ে একজন কর্মচারী, বোধ হয় মনিবকে খুশী করার মৎলবেই, অযাচিত ভাবে এগিয়ে এল।

'আজ্ঞে, আপনার কোটের হাতায় সবুজ মত কী দেখা যাচ্ছে। কিসের যেন দাগ। বিলিয়ার্ডের খড়ির দাগ বলেই বোধ হচ্ছে যেন। মুছে দেব কি?'

থরহরি ঘুরে দাঁড়ালেন। কর্মচারীটির আপাদ মস্তক তীক্ষ্নদৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন একবার। তারপর বললেন : 'এ বিলিয়ার্ডের খড়ি নয়। ফেস পাউডার। বুঝেছ?'

এই বলে সেই বিরাট ব্যক্তিত্ব, এক কথায় বিলিয়ার্ডের চকের মত সেই লোকটাকেই যেন মুছে দিয়ে, শান্ত গম্ভীর পদক্ষেপে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে

নেমে নিজের মোটরে গিয়ে উঠলেন।

মোটরে উঠে তাঁর মনে হল, কাশীপুরের বাগান বাড়িটার ধার ঘেঁষে গেলে হয় একবার। দেখা যাক না কী ব্যাপার।

কিন্তু পর মুহূর্তেই নিজের মত পালটালেন—হত্যাকারীরা নাকি কাণ্ডের পরে—সেই অকুস্থলে ফিরে এসে ফের আবার পরিদর্শন করে। ডিটেকটিভ বইয়ে এরকমটা তিনি পড়েছিলেন। তাই এই সূত্রে তাঁকেও যদি কেউ সন্দেহ করে বসে সেই ভয়ে, গাড়ির গতি তিনি পালটালেন না আর, বাড়ির দিকেই চললেন সটান।

খুনের পরদিন করোনারের তদন্ত শুরু হ'ল। কিন্তু তার ফলে পরিষ্কার হওয়া দূরে থাক। নতুন নানান জট পাকিয়ে পেকে উঠে রহস্য যেন আরো জটিল হ'য়ে উঠল। ডাক্তারি পরীক্ষার দ্বারা বিশেষ কিছুই জানা গেল না—পরিশেষে অনেক কিছু জানা গেল। উক্ত ডাক্তারের মতে মৃতের দেহে আঘাতের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কণ্ঠনালীর উপর চাপ পড়ায় নিঃশ্বাস-বায়ুর পথরোধে মৃত্যু ঘটেছে এমন সিদ্ধান্তও করা যায়, আবার আলজিভ আটকে গিয়ে মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব কিছু নয়। গলগ্রন্থির অত্যধিক স্ফীতি দেখা যাচ্ছে। এদিকে মস্তিষ্কের স্নায়বিক শিরাও বিচ্ছিন্ন। এইসব নানাবিধ লক্ষণ ও দুর্লক্ষণের মধ্যে ঠিক কোনটি নিশ্চিত রূপে মৃত্যুর কারণ তা নির্ণয় করে নিশ্চিত রূপে বলা সুকঠিন।

তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার দেখা গেছে বটে। মৃতের পাকস্থলীতে আধসেরটাক আফিম গোলা পাওয়া গেছে তরল পানীয়ের আকারে। এই সম্পর্কে করোনার কোর্টের সরকারী উকিল এবং ডাক্তারের জিজ্ঞাসাবাদ বিশেষ তথ্যপূর্ণ।

'পাকস্থলীর মধ্যে ওই পরিমাণের আফিম গোলা পাওয়া কি অস্বাভাবিক নয় মশাই?' তিনি প্রশ্ন করেছেন : 'বিশেষ করে একজন কাউন্সিলারের পাকস্থলীতে, আপনার কী মত?'

'একটু অস্বাভাবিক বই কি।' উত্তর হয়েছে ডাক্তারের : 'তবে, সেটা সাধারণ পক্ষেই প্রযোজ্য, একজন কাউন্সিলারের পেটে কিছুই অস্বাভাবিক নয়।'

'কিন্তু আধ সের আফিম গোলা একটু বেশী পরিমাণের বলে কি আপনার মনে হয় না?'

'তা ঠিক বলা যায় না।'

'তবে কি ওটা পরিমাণে কম আপনি বলতে চান?'

'না, তাও বলতে চাই না।'

'আধ সের আফিম গোলা গলাধঃকরণের ফলে মৃত্যু কি একান্তই অনিবার্য?'

'কোন কাউন্সিলারের বেলায় তা নাও হতে পারে। হ'তেই যে হবে তার কোন মানে নেই।'

'তবে কি—একজন কাউন্সিলারের পেটে আধমন আফিম গোলা পেলেই আপনি আশ্চর্য হতেন? এবং সেটা মৃত্যুর কারণ বলে মনে হয়?'

মোটেই না। কাউন্সিলারের হজমশক্তি সাধারণতঃই অসাধারণ।' ডাক্তারি তদন্তের জের এইখানেই শেষ।

তারপরে কৃত্তিবাসের চাকর উদ্ধবের জবানবন্দী নেওয়া হয়েছে। তার কাছ থেকে অনেক রহস্য বার হয়েছে—কিন্তু তা রহস্যের ওপর রহস্য, যেন কোয়ালিটির আইসক্রীমের ওপরে মালাই বরফ পড়ে সমস্যাটা আরো জমজমাট হ'য়ে গেছে যোগফলে। উদ্ধব দিব্যি গেলে বলেছে দুর্ঘটনার দিনে সে নিজের হাতে আধ সের আফিম মিছরির পানায় গুলে বিকেলের জলখাবারের সঙ্গে বাবুকে দিয়েছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও জানিয়েছে, এটা তার বাবুর নিত্য কর্মের মধ্যে প্রত্যহের বৈকালিক জলযোগ। সরকারী উকিলের জেরায় সে বলেছে যে, আফিমটা আধ সের নয় আধভরি ছিল মাত্র, মিছরির পানাটাই ছিল আধ সের। তবে দুটোয় মিলে আধ সের আধভরি হওয়া যে অসম্ভব নয়, এটা সে সম্ভব মনে করে। এই ভৃত্যটি, রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ভৃত্যের ন্যায় সর্ব গুণান্বিত না হলেও, বিশ বছর ধরে কৃত্তিবাসের তাঁম্বর তদারক করেছে সে কথাও জানা গেল।

ঘোড়ার গাড়ির কোচম্যানকেও পুঙ্খানুপুঙ্খ জেরা করা হ'ল। প্রায় তিন বছর থেকে সে কৃত্তিবাস সেনের এখানে কাজ নিয়েছে, দুর্ঘটনার দরুণ বাবুর মোটর গাড়ি অচল হওয়ার পর থেকেই সে আছে বলা যায়।

'একথা কি সত্য যে দুর্ঘটনার দিনে কর্তার সঙ্গে তোমার ভয়ঙ্কর কলহ হয়েছিল?' করোনারের উকিল জিজ্ঞেস করেছেন।

'কলহ কি জিনিস?' পালটা প্রশ্ন তোলে কোচম্যান।

'কলহ, মানে, ঝগড়াঝাটি।' জানান সরকারী উকিল; 'হয়েছিল কি তোমার বাবুর সঙ্গে?'

'তা একটু হয়েছিল হুজুর।'

'ঝগড়াটা কী নিয়ে তা কি আমরা জানতে পারি?'

'আজ্ঞে, কর্তা সিনেমা দেখার ছুটি দিচ্ছিলেন না বলেই।'

'সেই কারণে, কর্তাকে তুমি খুন করার ভয় দেখিয়েছিলে? সত্য কি?'

'না। সে কথা বলিনি।'

'কিন্তু লোকে যে শুনেছে তুমি খুন করব, খুন করব বলে চেঁচাচ্ছিলে?'

'কথায় কথায় আমার মাথায় এমন খুন চেপে গেছল যে আমার কোন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। আমার মাথায় খুন চেপে যাচ্ছে।'

হুজুর, 'আপনি আমার সামনে থেকে সরে যান। এই কথাই আমি বলে-ছিলাম।' বললে কোচম্যান।

'তখন খুন চাপেনি। এখন খুনটা মানে, খুনের এই বুদ্ধিটা তোমার মাথায় চাপছে তাই না কি?'

'না, হুজুর—' বললে কোচম্যান!

করোনার তাঁর নথিপত্রের প্রতি তাকালেন, 'অলকা দত্তকে ডাকা হোক,' হুকুম হোল তাঁর। অলকা দত্তের নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সারা আদালতে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল। অলকা ধীর পদক্ষেপে সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল।

ছিপছিপে পাতলা চেহারা অলকার। উজ্জ্বল ফর্সা মুখে অদ্ভুত এক দীপ্তি। প্রত্যেক অকাণ্ডের কু-কাণ্ডের সঙ্গে সমস্ত বিপর্যয়ের মূলে কোন না কোন মেয়ে জড়ানো থাকে। আদালতের মধ্যে ডিটেকটিভ বইয়ের পাঠক যারা ছিল তাদের কাছে তা অজানা ছিল না। এই চমৎকার মেয়েটি কি এই বিদঘুটে ব্যাপারের সঙ্গে কোনরূপে জড়িত নাকি? এই প্রশ্নটাই সেইসব পাঠকদের মনে বড্ড বেশী ধাক্কা মারছিল।

মেয়েটি কিন্তু সত্যই কাঁপছিল। সে যে খুব বিপন্ন বোধ করছে তার মুখচোখ দেখলেই তা মালুম হয়। কিন্তু তাহলেও পরিষ্কার স্বরে, আস্তে আস্তে, মিষ্টি সুরে সে তার বক্তব্য বলে গেল। তার সাক্ষ্যের কোনখানেও একটুখানি হোঁচট খেল না।

প্রশ্ন হল, 'কৃত্তিবাস সেনের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?'

অলকা। 'আমি তাঁর লেডি টাইপিস্ট' ছিলাম।'

প্রশ্ন। 'কতদিন ধরে এ-কাজ করছেন আপনি?'

উত্তর। 'প্রায় বছর তিনেক।'

প্রশ্ন। 'কখন আপনি কাজে যেতেন ফিরতেনই বা কোন সময়?'

উত্তর। 'আমি সকালের দিকেই যেতাম কেবল। বেলা দশটার মধ্যে আমার যা কাজ সব সেরে আমি বেরিয়ে পড়তাম।'

প্রশ্ন। 'সেখান থেকে বেরিয়ে আপনি যেতেন কোথায়?'

উত্তর। 'চৌরঙ্গীর এক রেস্তরাঁয় কিছু খেয়েটেয়ে বাড়ি ফিরতাম তারপর।'

প্রশ্ন। 'রোজই কি আপনি ঐ রেস্তরাঁয় দুপুরে খেয়ে থাকেন?'

উত্তর। 'হ্যাঁ, রোজ। এখনও।'

প্রশ্ন। 'রেস্তরাঁটার নামটা আমরা জানতে পারি?'

করোনার সরকারী উকিলের এই প্রশ্ন বাতিল করে দিলেন—নিতান্ত ব্যক্তিগত বলে এ কথার উত্থাপন তিনি অনুমোদন করলেন না।

জুরিদের একজন জিজ্ঞেস করল, 'শর্টহ্যাণ্ডও কি আপনার জানা আছে নাকি?'

'হ্যাঁ, পিটম্যানের।'

জুরিদের আরেকজন, 'আপনি কি সিনেমায় যানটান?'

এই প্রশ্নের জবাবে অলকা জানিয়েছেঃ 'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে, কেউ নিয়ে গেলেই।'

অলকার এই উত্তর আদালতের মনে খুব ভাল দাগ কেটেছে তার সম্বন্ধে সজুরি করোনারের ধারণা একটু উচ্চতর হয়েছে যেন। এই একটি কথায়

সেখানকার সর্বসাধারণের সহানুভূতি লাভ করল অলকা।

কিন্তু সরকারী উকিল তথাপি প্রশ্ন তুললেন : 'কুমারী অলকা দত্ত, একটি কথা কি আমরা জানতে পারি? খুনের পরে বিলিয়ার্ড রুমে যে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলতে দেখা গেছে সেটি কি—সেটি কি আপনার?'

করোনার হাঁ হাঁ করে পড়লেন—'না না। এ প্রশ্ন আমি কিছুতেই অনুমোদন করতে পারি না'—হাত নেড়ে তিনি বাধা দিলেন : 'এ কথা কেন? এসব অবান্তর কথা কেন? এ প্রশ্ন থাক। মিস দত্ত, আপনাকে আর কোন কথার জবাব দিতে হবে না। আপনি এখন কাঠগড়া থেকে নামতে পারেন।'

কিন্তু সবচেয়ে বেশী সোরগোল পড়ল থরহরিবাবুর বেলায়। বিশ্ববার্তার পরিচালক থরহরিবাবু তাঁর সাক্ষ্যে জানালেন, 'কৃত্তিবাসের খুনের দিন সন্ধ্যায় একত্রে এক সাহেবি হোটেলে খানা খেয়েছেন। এমন কি তাঁর নিজের মোটরে করে কাশীপুরের বাড়িতেও তিনি তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন।

'আপনি সেদিন সন্ধ্যা ঠিক ক'টার সময় কৃত্তিবাসবাবুর বাড়িতে গেছলেন?' জিজ্ঞেস করলেন সরকারী উকিল; এবং কতক্ষণ ছিলেন তাঁর সঙ্গে?'

'এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না'—বললেন থরহরিবাবু, 'কিছুতেই না।'

'কেন, এর দ্বারা কি আপনার এই ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়ার কোন সম্ভাবনা আছে?' জিজ্ঞেস করলেন থরহরিবাবুকে।

'তা হতে পারে।' বললেন থরহরি।

'তাহলে এর উত্তর দেয়া না দেয়া আপনার খুশি। আপনি স্বচ্ছন্দে নিরুত্তর থাকতে পারেন। আইনত সে অধিকার আপনার রয়েছে।'

থরহরিকে এই কথা বলে করোনার সরকারী উকীলের দিকে ফিরলেন: 'তাহলে ওঁকে আর এই প্রশ্ন করবেন না, উনি ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। অন্য কিছু জিজ্ঞেস করুন।'

'আচ্ছা বেশ।' সরকারী উকিল থরহরির দিকে আবার ফিরলেন: 'তারপরে, ওঁকে বাড়ীতে পৌঁছে দেবার পরে আপনারা দু'জনে অনেক রাত পর্যন্ত বিলিয়ার্ড খেলেছিলেন একথা সত্যি?'

'থামুন, থামুন!' করোনারের কাছ থেকে বাধা এল আবার: 'করছেন কী! এ প্রশ্ন আমি কিছুতেই করতে দিতে পারি না। একেবারে সোজাসুজি নিতান্ত খোলাখুলি এ কী অভদ্র প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য তেমন সাধু নয়—এর মধ্যে বিচ্ছিরি কোন ব্যাপারের ইঙ্গিত যেন আছে মনে হয়। আপনি অন্য কোন প্রশ্ন করুন।'

'বেশ তাই।' ঘাড় নাড়লেন সরকারী উকিল। 'আচ্ছা বলুন তো থরহরি-বাবু, নীল রঙের এই খামখানা এর আগে আপনি কখনো দেখেছেন কিনা?'

'আমার জীবনে নয়।' জানালেন থরহরি।

'অবশ্যই উনি দেখেননি।' বললেনঃ 'এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি করবার কী আছে? ও'র মতন মান্য ব্যক্তি কি অকারণে নিঃস্বার্থভাবে নির্জলা মিথ্যা বলবেন? দিন তো দেখি খামটা, কী আছে ওতে?'

'আজ্ঞে, এই খামখানা নিহত কৃত্তিবাসের জামায় আলপিন দিয়ে আঁটা ছিল হুজুর।'

'তাই নাকি?' বললেন করোনারঃ 'কী আছে ঐ খামে?'

আদালত শুদ্ধ রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতার মধ্যে সরকারী উকীল নীল খামের ভেতর থেকে সবুজ রঙের একখানা কাগজ বার করলেন। সবুজ খামখানায় আবার স্ট্যাম্প লাগানো। সবুজ পত্রের লেখাটা তিনি পড়তে লাগলেন তারপরঃ—

'আমি কাশীপুর কলিকাতা নিবাসী কৃত্তিবাস সেন বহাল তবিয়তে এবং সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় আমার এই সর্বশেষ উইল করিতেছি। এতদ্দ্বারা আমার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির সম্পূর্ণ দখলি স্বত্ব আমার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং একমাত্র উত্তরাধিকারী শ্রীমান কালু সেনকে দিয়ে গেলাম।'

সারা আদালত এই উইল শুনে একবারটি যেন খাবি খেল। কারো মুখে একটি কথা নেই। কেবল করোনার চারিদিকে ঘুরে ফিরে তাকালেন একবার।

'কালু সেন কি এখানে উপস্থিত আছেন?' হাঁক পাড়লেন করোনার।

কোন উত্তর এল না।

'এখানকার কেউ কি এই কালু সেনকে দেখেছেন?' আবার করোনারের ডাক শোনা গেল।

তবুও কোন সাড়াশব্দ নেই।

আবার সেই এক প্রশ্ন। তথাপি কাউকে নড়তে চড়তে দেখা গেল না।

'হুজুর, এই কালু সেনকে পাওয়া গেলেই এই মৃত্যু রহস্যের হয়ত কোন কিনারা হতে পারে। শেষ কথা বললেন সরকারী উকিল।

'হলেও হতে পারে।'

দশমিনিট ধরে গবেষণা করে জুরি এবং জজ একমত হয়ে তাঁদের রায়ে এটাকে খুন বলেই সাব্যস্ত করলেন। কে বা কারা অগোচরে এসে কৃত্তিবাস সেনকে খুন করে গেছে এইকথা তাঁদের রায় থেকে জানা গেল। আরও জানা গেল যে, এই কাণ্ডকে কিছুতেই আত্মহত্যা বলে গণ্য করা যায় না। জনৈক জুরি তাঁর স্বতন্ত্র রায়ে জানালেন, এই খুন যে শ্রীমান কালুর কীর্তি, সে ছাড়া আর কারো না, সে বিষয়ে তিনি দশটাকা বাজি ধরতেও রাজি আছেন।

করোনার উদ্ধব চাকরকে বেকসুর খালাস দিয়ে উক্ত কালুর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বার করার হুকুম দিলেন।

হতভাগ্য কাউন্সিলারের ধ্বংসাবশেষ মর্গ থেকে উদ্ধার করে স্বর্গের পথে রওনা করে দেওয়া হল। যতদূর সম্ভ্রম এবং সমারোহের সঙ্গে কাউন্সিলারের

তুল্য একজনের সদ্‌গতি করা উচিত তার কোনই ব্যত্যয় হল না। তাঁর শব যাত্রাকে প্রায় শোভাযাত্রায় পরিণত করার প্রয়াস করা হয়েছিল—তবু কেবল রাস্তার কয়েকটা বকাটে চ্যাংড়া ছাড়া নিমতলা ঘাট অবধি শেষ পর্যন্ত কেউ গড়াল না। প্রত্যেক রাস্তাতেই এই চ্যাংড়ারা স্বাভাবিক কৌতূহল বশে কিম্বা হরিবোল দেবার স্বর্গীয় প্রলোভনে কাউন্সিলারের পিছু নিয়েছিল, কিন্তু নিজেদের পাড়ার সীমানা পর্যন্ত এগিয়েই ফের পিছিয়ে এসেছে, যাই হোক, রিলে রেসের মত বদলে গেলেও কোন না কোন রূপে এই চ্যাংড়ারাই, কাউন্সিলারটির শূন্য স্থান পূর্ণ করার কোন স্বার্থ বা সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও এই অপূরণীয় জাতীয় ক্ষতির মহিমা এবং মর্যাদা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছে দেখা গেল।

কলিকাতা মহানগরী আবার তার সুস্থ অবস্থায় ফিরে এল। কৃত্তিবাস সেন এবং তাঁর মৃত্যু রহস্য আস্তে আস্তে ভুলতে বসল সবাই।

ভুলল না কেবল কান্তি। আহার নেই নিদ্রা নেই কেবল টো টো করে ঘুরছে। রোদ নেই, বৃষ্টি নেই (এবং সেই জন্যই মাথায় ছাতা নেই) ঘুরছে সে। এই এখানে এই সেখানে—কোথায় নেই? সর্বত্র সে। কালু সেনের সন্ধানেই ঘুরছে কান্তি। যেখানেই কয়েকজন জড় হয়ে গুলতানি করছে কান্তি হাজির, আর কিছু না, কালু সেনের খোঁজে। হাওড়া শেয়ালদার মত জায়গায়, হাজার হাজার লোক সর্বদাই যেখানে ওতপ্রোত হচ্ছে অনুক্ষণ, কত যাত্রীর যাতায়াত কান্তি মিত্র সেখানে ক্লান্তিহীন। এই সে এধারে আবার সে ওধারে প্রত্যেকটি লোকের মুখে গভীর এবং তীক্ষ্ন দৃষ্টিপাত বুলিয়ে নিতে ব্যস্ত সে। একবার এক টিকিট চেকার তো ওর ঘাড়খানাই ধরল, কী হচ্ছে? কী হচ্ছে ঐ সব? লোকের মুখের দিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন হে!' কান্তি বলল—'একজন দাগী আসামীর সন্ধানে আছি আমি। আমি ডিটেকটিভ।'

'মাপ করবেন, আমি জানতাম না। কিছু মনে করবেন না', বলে কাঁপতে কাঁপতে সাত হাত পিছিয়ে গেছে সেই কর্মচারী। গোয়েন্দা আর সাপ কখন কাকে ছোবল মারবে বলতে পারে কেউ? শত হস্তেন গোয়েন্দানাং—একজন গোয়েন্দাও আরেকজনের থেকে একশো হাত তফাতে থাকে।

সারাদিন ধরে এধারে ওধারে নানাধারে কান্তি ইতস্তত করছে। কামাই নেই তার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে চায়ের দোকানে বসে—একটার পর একটা দোকানে এবং যত চা-পায়ী আসছে যাচ্ছে তাদের ওপর নজর দিতে তৎপর। এমন কি, তিনদিন সে ছুতোরের ছদ্মবেশ ধরে কি এক ছুতোর থরহরিবাবুর বাড়ির দ্বারদেশে কাটিয়েছে—যদি সেখান থেকেই এই কালুর কোন সন্ধান মেলে।

কিন্তু তথাপি এই কালুর কোন হদিশ নেই। যতদূর জানা আছে শ্রীমান তিন বছর আগে অবধি তার কাকা কৃত্তিবাসের আলয়ে থাকত তারপর হঠাৎ সে একদিন, কেন বলা যায় না, সেখান থেকে উধাও হল। এই পান্তাড়ি গুটোবার

পর থেকে আর তার কোন খবর নেই। সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, বিশ্ব-বার্তার বিখ্যাত সম্পাদকীয় ভাষায় এই মন্তব্য করা হয়। ধরণী দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে হাঁ করে গিলে ফেলল নাকি তাকে?—এ প্রশ্নও করা হয়েছিল তখন।

তিন বছর আগে বিশ্ববার্তার সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাই বলা হোক না কেন; কান্তি কিন্তু হার মানার পাত্র নয়। উক্ত হাঁ করা ধরণী কে হতে পারে—তা নিয়ে অবিশ্যি সে একটু মাথা ঘামিয়েছিল। যেই হোক—কৃত্তিবাস সেনের কর্পোরেশনের প্রতিদ্বন্দ্বী ধরণী সেন নয়, এই বিষয়ে নিরসন্দিগ্ধ হবার এক সপ্তাহ বাদেই সে আদ্যনাথের কাছে গিয়ে হাজির হল।

'দারোগাবাবু', বলল গিয়ে কান্তি; 'আমার আরো কতকগুলি বিষয় জানা দরকার। আমাকে আর একবার কৃত্তিবাস সেনের কুটিরে নিয়ে চল তো।'

দুজনে আবার বরানগর কাশীপুরের সেই বিরাট অট্টালিকায় প্রবেশ করল। বিলিয়ার্ড ঘরে পা দেবার সময় কান্তি বলল : 'প্রথম বারে হয়ত এখানকার কিছু কিছু আমাদের নজর এড়িয়ে গিয়ে থাকবে। আজও তা অসম্ভব নয়।'

'তা তো হয়ই। নজর এড়িয়ে যায়ই তো—।' কান্তিকুমারের অভিযোগে আদ্যনাথবাবু সায় দিয়েছেন।

'আচ্ছা, এখন বলতো'—কান্তি আরম্ভ করে (তারা তখন সেই বিলিয়ার্ড টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে)—এই খুনের ব্যাপারে তোমার নিজের ধারণাটা কী? তোমার, মানে পুলিশের ধারণার কথাই আমি বলছি। ধারণাগুলি একে একে বাৎলাও দেখি। সবগুলিই আমার জানা দরকার।'

'আমাদের প্রথম ধারণা কী ছিল তা তো তোমার অজানা নয় কান্তি। এই হত্যাকাণ্ড এডেন থেকে সদ্য আগত কোনো এক-পা ওয়ালা (আরেক পায়া কাঠের) দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীর দ্বারা ঘটেছে—এই ছিল আমাদের সর্বপ্রথম ধারণা।'

'বেশ উচ্চ ধারণা। এমন কিছু অসংগত নয়।' সায় দিল কান্তি। আমাদের ধারণা এই লোকটা হচ্ছে কোনো মালবাহী জাহাজের খালাসি একঘেয়ে সুরে একটানা পূর্ব বৃত্তান্ত দিতে শুরু করল আদ্যনাথ।—'এই লোকটা অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সাহায্যে ত্রিশ ফুট উঁচু এই বাড়ীর গা বেয়ে উঠে—একজন রাজমিস্ত্রীও সারা দিনে যায় সাত ফুটের বেশি উঠতে পারে না—উঠে এই বিলিয়ার্ড ঘরের জানলার বাইরে পেঁাছে অসাধারণ কৌশলের দ্বারা বাইরে থেকে খড়খড়ির খিল খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল, লোকটা যে অসাধারণ ধূর্ত তাও বেশ বোঝা গেছল নিহত কৃত্তিবাসের গলায় প্যাঁচানো রুমালের অদ্ভুত পাক দেওয়া দেখে। ওরকম কড়া পাক কেবল ভবানীপুরের সন্দেশের দোকানে আর এডেনের বাড়ি বাড়ি বদমাইসের রুমালেই দেখতে পাওয়া যায়, এবং এও জানা গেছল যে লোকটার একটা পা বিলকুল কাঠের—'

বলতে বলতে আদ্যনাথ দারোগা থামলেন! তাঁকে যেন একটু চিন্তাকুল

দেখা গেল। কান্তি শুধালো, 'কুল কাঠের বলছো?'

'না, না, একদম কাঠের এই রকমই আমাদের ধারণা হয়েছিল প্রথম। কিন্তু কেন যে এরূপ ধারণা হ'ল তা এখন আমি বলতে পারব না। একদম আমার মনে পড়ছে না।'

'দূর, দূর! কী যে বল তুমি আদ্যনাথ? এই ধারণা হবার কারণ এই যে বিলিয়ার্ড টেবিলের ওধারের মেহগনির ওপরে লোকটির হাতের চাপ পড়েছিল এবং চাপটা বেশ একটু বেশী রকমেই পড়েছিল—সেটা সাধারণ মানুষের চাপ হিসেবে ঠিক স্বাভাবিক নয়। তাই থেকেই বোঝা গেল যে লোকটার উপরার্ধের ভার নিম্নার্ধের চেয়ে গুরুতর, তাই নয় কি? তাই থেকেই লোকটার কাঠের পা সম্বন্ধে ধারণা জন্মালো—পায়ের দিকটা তার মাথার দিকের চেয়ে হালকা বলেই না? এই কাঠের ধারণা তার সম্বন্ধে এমন কিছু কঠোর ধারণা নয়। কিন্তু এই প্রাথমিক ধারণা এখন আমরা বর্জন করেছি, তাই নয় কি?'

'নিশ্চয়ই। প্রথমকার ধারণা আমরা প্রথমেই বর্জন করে থাকি। আমাদের চিরকালের দস্তুর। আমাদের দ্বিতীয় ধারণা হচ্ছে—'

কিন্তু কান্তির কান আর সেদিকে ছিল না।—মেঝের ওপর কি যেন সে তীব্র নেত্রে নিরীক্ষণ করছিল।

'হাঃ হাঃ! এ কী দেখছি মেঝেয়?' আনন্দ কি দুঃখ কিসের আবেগে বলা যায় না, পুনঃ পুনঃ অট্টহাসি শোনা গেল কান্তির: 'এর অর্থ কী? হাঃ হাঃ হাঃ!'

মেঝের একটি অমার্জিত জায়গায় আদ্যনাথের দৃষ্টি সে আকর্ষণ করল!

'এ তো আমরা দেখিনি।' বললেন আদ্যনাথ: আগে তো দেখিনি।'

'পায়ের দাগ। পায়ের নয়, জুতোর।' বলতে বলতে কান্তি পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বার করে পরীক্ষা করতে শুরু করেছে। 'একজোড়া জুতোর ছাপ একটাও তার কাঠের নয়। নাগরা জুতো বলেই মনে হচ্ছে—লক্ষ্ণৌয়ী নাগরা। তবে আগ্রার হলেও আশ্চর্য হব না। জুতোর তলায় বড় বড় কাঁটা মারা কিম্বা ঘোড়ার পায়ে যেমন নাল লাগানো থাকে তাও হতে পারে। লোকটা পাঁচ ফুট সাড়ে ন ইঞ্চি লম্বা।'

'একটু সবুর কর, কান্তি।' আদ্যনাথ বাধা দিয়ে বললেন: 'তুমি যে কী বলছ আমি ঠাওর করতে পারছি না। লোকটা যে ঠিক অতটাই লম্বা তা কি করে তুমি জানলে?'

'পায়ের পাতার পরিধি থেকে পা কতখানি উঁচু তা ধরতে পারছি। আর পায়ের দৈর্ঘ্য পেলে লোকটার উচ্চতা টের পেতে অসুবিধা হয়? আদ্যনাথ, এই নাগরাওয়ালা লোকটাকে এক্ষুনি পাকড়াও। ওকে পেলেই এই খুনের রহস্য ভেদ হবে।'

এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই সিঁড়ি দিয়ে নাগরা জুতোর খটাখট শোনা গেল। বিলিয়ার্ড ঘরের দরজা খুলে সেই নাগরাওয়ালা প্রবেশ করল তারপর।

কান্তি এবং আদ্যনাথ দু'জনেই একসঙ্গে চমকে উঠলেন। এমন কি, সেই ঘরে চোখের সামনে তখন নায়াগ্রা প্রপাত দেখলেও বোধ হয় তাঁরা ততখানি বিচলিত হতেন না।

লোকটা ঠিক পাঁচ ফুট সাড়ে ন ইঞ্চি লম্বা। পায়ে তার নাগরা (লক্ষ্ণৌ বা আগ্রা যেখানকারই হোক)। লোকটার পরণে কোচম্যানের পোষাক। আদব কায়দা কেতাদুরস্ত। পরলোকগত কৃত্তিবাসের ঘোড়ার গাড়ির কোচম্যান! দেখামাত্র বুঝতে কান্তি বা আদ্যনাথের কোন বেগ পেতে হ'ল না।

'আপনি কি কান্তিবাবু?' জিজ্ঞেস করল সেই কোচম্যানঃ—'একটি ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক।'

'ভদ্রমহিলা! ভদ্রমহিলা এখানে কেন আবার!' প্রশ্ন হ'ল আদ্যনাথের।

হতচকিত কান্তি প্রশ্নাহত হয়ে বললঃ 'খুনের রহস্যের সঙ্গে মেয়েরা জড়িত থাকে তা কি তোমার জানা নেই আদ্যনাথবাবু?'

'জানি।' জানালেন আদ্যনাথঃ 'জানি বই কি। কিন্তু ভদ্রমহিলা কি মেয়ে? তারা তো পুরুষের কান কাটে। পুরুষের বাবা তারা!'

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে কান্তি কোচম্যানকে বলল—'তাকে আসতে বলো।'

পরমুহূর্তে সিঁড়িতে প্রায় নিঃশব্দ পদধ্বনি শোনা গেল। লম্বা এবং চমৎকার একটি তরুণী অতি আধুনিক বেশভূষায় সুসজ্জিত হ'য়ে ঘরের মধ্যে পদার্পণ করলেন।

কুমারী অলকা দত্ত।

অলকার সাজসজ্জায় আধুনিকতার অত্যন্ত উগ্রতা থাকলেও তার হাতে যে ভ্যানিটি ব্যাগ ছিল না তা কান্তির তীক্ষ্ন দৃষ্টি এড়ায় নি।

'কান্তিবাবু,' অলকা উচ্ছসিত স্বরে বললঃ—'আপনিই কান্তিবাবু, তাই না? এরা বলছিল যে, আপনি এখানে এসেছেন। কান্তিবাবু, আপনি আমায় বাঁচান।'

অলকার দেহ থর থর কাঁপছিল। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল তার। 'শান্ত হও কুমারী অলকা দত্ত।' সান্ত্বনার ছলে বলল—কান্তি। বিচলিত হোয়ো না। এত ঘন ঘন তোমার নিঃশ্বাস বাজে খরচ করো না। এমন হাঁসফাঁস করবার কী আছে, আমাকে বিশ্বাস কর। আমি তোমাকে বাঁচাব নির্ঘাত।'

'আমারো তাই বিশ্বাস।' নিঃশ্বাসের দ্রুতগতি অনেকটা কমিয়ে এনে বলল অলকা।

'কী বলবার আছে আমায় তুমি বল।' বলল কান্তি!

'কান্তিবাবু'—নিজেকে সামলাতে পারলেও তখনো অলকার গলা কাঁপছিল, 'আমার ভ্যানিটি ব্যাগটা আমার চাই।'

'বোস। দিচ্ছি এনে।' এই বলে, কান্তি আলনার আঁকশি থেকে ব্যাগটা

পেড়ে এনে অলকার হাতে তুলে দিল।

'আঃ, এটা ফিরে পেয়ে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে কী বলব।' ব্যাগটাকে আদর করে নিজের গালে বুলিয়ে নিল অলকা।—আপনাকে যে কী ভাষায় ধন্যবাদ জানাবো জানিনে। এটা নিতে আসতে যা ভয় করছিল আমার।'

'না, না, ভয়ের কোন কারণ নেই।' আদ্যনাথবাবু জানালেনঃ পুলিশের ধারণা এই ব্যাগটা হ'চ্ছে এই বাড়ির বুড়ি ঝির। আপনি স্বচ্ছন্দে এটা নিতে পারেন।'

কান্তি কিন্তু মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল—'আমার মনে হয় এই খুনের ব্যাপারের অনেক কিছুই তুমি জানো। সত্যি কি না? তাহ'লে আমাকে বল সে সমস্ত।'

'বলব! আমি বলব কান্তিবাবু। ওঃ, কী ভয়ঙ্কর সেই রাত—ভাবলে এখনো আমার বুক কাঁপে। এখানেই আমি ছিলাম তখন। সব দেখেছিলাম—না দেখলেও নিজের কানে শুনেছি সব।'

অলকা বারম্বার কেঁপে উঠল।

'ওঃ, কান্তিবাবু, এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি। সেদিন সন্ধ্যায় আমি এখানে এসেছিলাম। হাতের অনেক কাজ বাকী পড়েছিল, সেগুলো সারতে এসেছিলাম! কৃত্তিবাসবাবুর সেদিন সন্ধ্যায় কোথায় যেন নেমন্তন্ন শুনে-ছিলাম; কাজেই নিরিবিলি আপিস ঘরে বসে আমার কাজ সারতে কোন বাধা হবে না ভেবেছিলাম। যখন এলাম, কেউ ছিল না তখন। এই বিলিয়ার্ড-ঘর পেরিয়েই তো গেলাম। এখানে আলনায় আমার ভ্যানিটি ব্যাগ রেখে ও-পাশের আপিস ঘরে গিয়ে নিজের কাজে মন দিয়েছি—কতক্ষণ একমনে কাজ করেছি তা মনে নেই—হঠাৎ বিলিয়ার্ড ঘরের ভেতর থেকে চেঁচামেচি আমার কানে গেল। চেঁচামেচি ক্রমশ ঝগড়া হয়ে দাঁড়াল—দু'জনে দারুণ কলহ—শুনলাম। সমস্তই নিজের কানে শুনতে হোলো। শোনা খুব অন্যায় হয়েছে কি কান্তিবাবু?'

'কিছুমাত্র না।' বলল কান্তি : 'চোখের পাতা বোজা যায়—অবাঞ্ছনীয় দৃশ্য আমরা ইচ্ছা করলে নাও দেখতে পারি। কিন্তু কানের পাতা বোজবার যে কোন যো-ই রাখেননি বিধাতা, অলকা দেবী!'

'আপনার বলার ধরণ শুনে শরৎবাবুর উপন্যাসের কথা মনে পড়ছে, কিন্তু সে কথা থাক, কান্তিবাবু! তারপরে কী শুনলাম শুনুন, একজন বলছিল, য়্যায়, কী হচ্ছে? তুমি টেবিলের ওপর অতটা ঝুঁকি দিচ্ছ কেন? আরেকজন বলল, 'আমার খুশি!' তখন প্রথমজন বলল, 'টেবিলের ওপর থেকে তোমার ভুঁড়ি সরিয়ে নাও। হঠাও তোমার ভুঁড়ি। দ্বিতীয়জন বলল—হঠাবো না। আমার ভুঁড়ি আমার—তোমার কি? তখন সেই এক নম্বর লোকটা বলল—ভয়ঙ্কর গর্জে উঠল এবার—তোমার ভুঁড়ি তোমার? বটে? এক্ষুনি সরিয়ে নাও বলছি, নইলে এই পিস্তলের গুলিতে, দেখছো তো, ঐ ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে

দেব! তারপরে খানিকক্ষণ চুপচাপ। তার একটুবাদেই করুণ আর্তনাদ শুনতে পেলাম—ফাঁসিয়েছ, ফাঁসিয়েছ। সত্যি তুমি ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিলে! তখন অপর ব্যক্তিটি নরম গলায় একটু অনুতপ্ত সুরেই বলল যেন, 'আমায় ক্ষমা কর ভাই। আমি ফাঁসাবো বলে ফাঁসাইনি। আমার গুলি যে তোমার ঐ গণ্ডারের চামড়া ভেদ করতে পারবে এ বিশ্বাস আমারও ছিল না।'

'তারপর কি হলো?'

তারপর আমার এমন ভয় হ'ল, আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। দুদ্দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালিয়ে একছুটে নিজের বাড়িতে চলে এসেছি। পরদিনের খবরের কাগজে সে রাত্রির সমস্ত ঘটনা জানা গেল। আমার ব্যাগটা বিলিয়ার্ড রুমে পড়ে আছে তাও জানতে পারলাম। তারপর থেকে যে কী ভয়ে ভয়ে আমি রয়েছি—কান্তিবাবু, আপনাকে কী বলবো! আপনি আমাকে বাঁচান!'

'অবশ্যই বাঁচাবো, তুমি ভয় খেয়ো না অলকা। নির্দোষীকে কেবল মারা নয়, মাঝে মাঝে বাঁচানোও আমাদের গোয়েন্দাদের ধর্ম বই কি? তুমি ঠাণ্ডা হও। এখন একটি কথা আমায় বল দেখি, যে লোকটি কৃত্তিবাস সেনের বিপক্ষে খেলছিল—তাকে কি তুমি দেখেছিলে?'

'একবার মাত্র, চকিতের জন্যই' বলতে বলতে একটু ইতস্ততঃ করল অলকা: দরজা একটুখানি ফাঁক করে—সেই ফাঁকে ঈষৎ একটু দেখেছিলাম...খুব অন্যায় করেছি, মাপ করবেন।'

'কী রকম দেখতে লোকটা?' জিজ্ঞেস করল কান্তি; 'মুখ দেখলে কি মনে হয় তার মনের মধ্যে প্রবেশ করা অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার, খুব দুর্ভেদ্য—অনেকটা এইরকম মুখ কি?' কান্তি মিত্র কায়ক্লেশে নিজের মুখে অলকার সম্মুখে মৌখিকভাবে সেই দৃষ্টান্তটা দেখাবার চেষ্টা করে।

'অবিকল!'

প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া একটা মুখ—মনে হয় সমস্ত দেহে শুধু ঐ মুখখানাই আছে কেবল?'

'তাই মনে হয় বটে।'

'অলকাদেবী,' কান্তি জানালো: 'এই মুখ সর্বস্ব লোকটির যখন আঁচ পেয়েছি তখন এই খুনের রহস্য আমি প্রায় ভেদ করে এনেছি বলতে হবে। এর বাকিটুকুর যখন কিনারা করতে পারব তখন গোটা গল্পটা আগাগোড়া এসে বলব তোমায়। শুনবে তো তুমি?'

কান্তি ভরাট দৃষ্টি নিয়ে তাকালো অলকার মুখে।

'শুনব বইকি। আপনি বলবেন: আমি শুনব না?' জবাব দিল অলকা।—'আপনার কথা শুনব না কী যে বলেন?'

এবং এই কথা বলে কুমারী অলকা দত্ত নিজের ব্যাগ হাতে নিয়ে তেমনি নিঃশব্দ আওয়াজে নেমে গেল নীচেয়।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কান্তি টেলিফোন হাতে করেছেঃ 'হ্যালো এটা কি বিশ্ববার্তা অপিস? অ্যাঁ?..বিশ্ববার্তা? বড়কর্তার ঘরে দাও।...ও আপনি? বড়কর্তা?...আমি কান্তি। কাশীপুরের রহস্য আমি প্রায় সমাধান করে এনেছি।...'

বলেই কান্তি মুহূর্তখানেক কান খাড়া করে রইল—প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু থরহরিবাবুর কণ্ঠস্বরে কিছুমাত্র থরহরি পাওয়া গেল না। অবিচলিত স্বরে তাঁর জবাব এল।

'কালু সেন কি ধরা পড়েছে?'

থরহরিবাবু, কেবল কালু সেন নয়, এই মৃত্যুরহস্যের আগাগোড়া আমি ধরেছি। ধরতে পেরেছি।' —কান্তি বলল, তার বলার কায়দা আর প্রত্যেকটি কথায় বিশেষত্ব দিয়ে। বিশেষ ব্যঞ্জনা দিয়ে বলল কান্তি—। 'কার মৃত্যু হ, সকলেই আমরা জানি। খুড়ো কৃত্তিবাস মরেছেন, এইটুকুই জেনেছি কেবল। এবং এও জানা গেছে যে, কৃত্তিবাসের ভাইপোই তাঁকে মেরেছে। কিন্তু কেন মেরেছে, কী ভাবে মেরেছে এবং সেই ভাইপোই বা কোথায় এখন অবধি তার কিছুই আমরা জানতাম না। মৃত্যু কাহিনীর এই পরিচ্ছেদগুলো পাওয়া যাচ্ছিল না। এই পরিচ্ছেদগুলোকেই আমি পাকড়েছি, সেই কথাই জানাতে চাই আপনাকে।'

'বটে? বেশ তো,' অচঞ্চলস্বরে বললেন থরহরি! 'বেশ'।

'এবং এই কাহিনীটাই আগাগোড়া, পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ আপনাকে আমি শোনাতে চাই।'

'কিন্তু এই টেলিফোন কানে শোনা তা কি সম্ভব হবে? যদি হয় তো শোনাও। দু'কথায় দু মিনিটের মধ্যে শোনাতে পারলে আমার আপত্তি নেই।'

'কিন্তু দু-মিনিটের রামায়ণ গান, স্বয়ং রামচন্দ্র কান পাতলেও, বোধহয় শোনানো যায় না।' কান্তি খানিক ইতস্ততঃ করে, স্বভাবতই, কিন্তু বেশিক্ষণ সে ইতস্ততঃ করে না।

'গল্পটা টেলিফোনে না বলে বিলিয়ার্ড টেবিলে বললে বোধহয় ভাল শোনাবে। সচিত্র করে বলা যাবে হয় ত।'

'তার মানে?' থরহরি প্রশ্ন করলেন।

'তার মানে আপনি বিশ্ববার্তা থেকে সোজা আপনার বাড়িতে আসুন। আমিও যাচ্ছি। সেখানে আমাদের দু'জনের বিলিয়ার্ড খেলার ভেতর দিয়ে আমার বক্তব্যটা ব্যক্ত করব। এই ব্যাপারটার এমন কতকগুলি বিশেষ দিক আছে তা বিলিয়ার্ডের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে না দেখলে ধরা পড়বে না। যদি আপত্তি না থাকে, আপনাকে পঞ্চাশ পয়েণ্টের খেলায় আমি চ্যালেঞ্জ করতে প্রস্তুত—তার মধ্যেই খেলা এবং আমার গল্প দুই-ই খতম হবে। বেশীক্ষণ আপনাকে কষ্ট দেব না আমি।'

থরহরি বললেন, 'বেশ'।

'শেষ হল তো ভালই, নইলে তোমাকেও আমি শেষ করব।' সেইসঙ্গে একথাও তিনি মনে মনে বললেন কি না কে জানে। থরহরির দুর্গম মনস্তত্ত্বে প্রবেশ লাভ করা যে কোন কল্পনা কুশলী লেখকের পক্ষেও যথেষ্ট কঠিন।

থরহরিকে বিলিয়ার্ড চ্যালেঞ্জ করা একটা যা তা নয়। তাঁর মত ধীর মস্তিষ্ক এবং স্থির প্রতিজ্ঞ খেলোয়াড় কলকাতায় খুব কমই আছে। তাঁকে বিলিয়ার্ডে হারাতে কদাচ কেউ পেরেছে। একচোটে নয় দশ কি বারো পর্যন্ত মারবার সুখ্যাতি শোনা যেত তাঁর। টেবিল থেকে বল উড়িয়ে দেয়া তো তাঁর পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার। তিনটে বলের কে কোথায় রয়েছে, তাঁর শ্যেনদৃষ্টির কাছে এড়াবার জো ছিল না এবং তাদের কোনদিকে কীভাবে পিটতে হবে স্বভাবতই তিনি টের পেতেন।

তবে কান্তিও প্রতিপক্ষ হিসাবে কিছু কম যায় না। আষাঢ়ির মার ব'লে একটা কিছু আছে—কান্তির ছিল সেই সুবিধে! কান্তি বিলকুল আষাঢ়ি। বিলিয়ার্ডের বিষয়ে অল্পদিনের পুঁথিগত বিদ্যা তার। তবে, সংবাদপত্রের রিপোর্টারের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। কাজেই এর আগে কখনো আর না খেললেও কান্তি কোন অংশে কম যায় না।

অদ্ভুত বিলিয়ার্ডের চাল কান্তির। কুশনের আড়ালে নিজের বল রেখে প্রতিপক্ষের আঘাত থেকে রক্ষা করছে এবং তার নিজের মারের বেলায় হয় সেই বল সবেগে নয় একলাফে ধারের পকেটে গিয়ে স্থান লাভ করেছে।

স্কোর খুব চটপট বেড়ে উঠল—দুজনেই প্রায় সমান সমান! আধঘণ্টা খেলার শেষে এরও দশ ওরও দশ। থরহরি তাঁর ভারি মুখ আরও ভার করে উঠে পড়ে লেগেছেন—টেবিলের ওপরে তাঁর এক পা। কান্তি উত্তেজনার চূড়ান্ত সীমায় উঠেও অতীব শান্ত: বলের ওপর সে ঝুঁকে পড়েছে। বল আর তার চোখের মধ্যে এক ইঞ্চির ফারাক!

পনেরোর সময়েও তারা সমান। থরহরি হঠাৎ একচোটে তিন পয়েণ্ট মেরে বসেছে। কিন্তু এ চোটও সামলে নিয়েছে কান্তি। আরো মিনিট কুড়ি খেলার পর দু'জনে উনিশে এসে সমকক্ষ হয়েছে আবার।

কিন্তু কান্তিকুমার মিত্রের মনে খেলায় জেতা ছাড়াও অন্য আরো কিছু ছিল বুঝি। এইবার সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল। তার সুযোগ এল এতক্ষণে। দক্ষ হাতের এক মারে, খুব ওস্তাদও কদাচ যা পারে, কান্তি থরহরির বলকে বেশ একহাত দেখে নিল। লাল বলটা পকেটের হা-এর মুখে গিয়ে দাঁড়ালো। সাদা বলটা ঠিক মাঝখানে। কান্তি থরহরির মুখের দিকে তাকিয়ে।

বলগুলি ঠিক সেই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, কৃত্তিবাসের মৃত্যু তিথিতে তাঁর বাড়ির টেবিলে ঠিক যেমনটি করে দাঁড়িয়েছিল!

'আমি ইচ্ছে করেই ওরকমটা করেছি।' বলল কান্তি। সহজ সুরেই বলল।

'তার মানে?' জিজ্ঞেস করলেন থরহরি।

বলের ঐরূপ অবস্থা দেখেও তিনি যে কিছু দুর্বল হয়েছেন তা মনে হল না। 'তার মানে ঐ বলের মধ্যেই রয়েছে।' কান্তি জানালো। 'থরহরিবাবু আসুন, এবার একটু বসা যাক! আপনাকে আমার কয়েকটি কথা বলার আছে। অবশ্যি যা বলব, তা আপনার অজানা নয়। আপনি বুদ্ধিমান, ইতিমধ্যেই তা আঁচ করতে পেরেছেন।'

কান্তির কথাতেও বেশ আঁচ। তার ভেতরে যে আগুন জ্বলছিল তারই আঁচ বোধহয়, কান্তি আজ অগ্নিকাণ্ড না করে ছাড়বে না। যে থরহরি সারা বিশ্বময় বিশ্ববার্তাকে থরহরি কম্পিত করে রাখেন, তার সামনে দাঁড়িয়ে এখনো সে অকম্পিত।

দুজনে মুখোমুখি দুটো কুশন অধিকার করে বসল। থরহরি শান্তভাবে একটা সিগ্রেট ধরালেন। মনে হল তাঁর হাত যেন একটু কাঁপল—সিগ্রেট ধরানোর সময়ে। চকিতের জন্যই মনে হ'ল কান্তির।

'বেশ।' সিগ্রেট মুখে তিনি প্রশ্ন করলেন—'কী বলতে চাও বল?'

'থরহরিবাবু'—কান্তির কান্তি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মনে হয়—'দুসপ্তাহ আগে আপনি আমাকে এক জটিল রহস্য সমাধানের ভার দিয়েছিলেন! তার কিনারা আমি করেছি। আজ রাত্রে—এখানে—এই মুহূর্তে এখনই সেই সমাধান আপনাকে জানাতে পারি। আপনি কি তা জানতে চান?'

থরহরির কপালে কি কপোলে একটিও রেখা পড়তে দেখা গেল না।

'বেশ তো।' বললেন তিনি। 'জানাই যাক না।'

'একটা মানুষের জীবন বিলিয়ার্ড খেলায় খতম করে দেওয়া যায়—স্বচ্ছন্দেই যায়—তাই না, থরহরিবাবু?' কান্তি বলে: 'আপনার কাছে অপরের জীবনের দাম বিলিয়ার্ডের চেয়ে বেশী নয় কি?'

'তার মানে? তুমি বলতে চাও কী?' এইবার থরহরির হুঙ্কার শোনা গেলঃ 'তুমি কী বলতে চাও শুনি একবার?'

তার মানে—তুমি তুমিই খুন করেছ কৃত্তিবাসকে।' কান্তি বলল দৃঢ়স্বরে। থরহরির সামনে দাঁড়িয়ে কোথেকে—যে, কেবল স্বরে নয়, ব্যঞ্জনাতেও তার দৃঢ়তা এল কে জানে! এবং নিজের আমিত্বে পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে থরহরির সঙ্গে আপনা আপনিও যেন সে ভুলে গেল। স্রেফ তুমি ও তাঁকে পর্যবসিত করতে একটুও তার দ্বিধা হ'ল না।

তুমিই! বিশ্ববার্তা পরিচালক শ্রীযুক্ত বাবু থরহরি দত্ত দুর্দান্ত প্রতাপশালী, চক্রান্তকারী এবং বদমায়েস—এত দিনে তোমার স্বরূপ এবং চালচলন প্রকাশ পেয়েছে। তুমি ধরা পড়েছ!'

থরহরির বিপক্ষে তার মনে তার নিজের অগোচরে এতদিন ধরে যে এত রাগ এবং এত বেশী বিরাগ পুঞ্জীভূত হয়েছিল, তা কান্তি নিজেই জানত না—কিন্তু কেন যে হয়েছিল তা না জানলেও, এবার তার প্রকাশের সরঙ্গ ও

সংগত পথ পেয়ে তার সমস্ত উষ্মা যেন লাভা প্রবাহের মত টগ্‌বগ্‌ করে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। থরহরিকে ধরে থোরের মত কুচি-কুচি করে কাটতে পারার ভেতর এত যে আনন্দ আছে তা সে জানত না। হাতিকে কাত দেখতে পেলে হস্তিদলিতদের যে অপার্থিব আনন্দ দেখা যায়—এ বুঝি সেই আনন্দ।

'কুচক্রী, ভণ্ড এবং বিশ্বাসঘাতক বাবু থরহরি দত্ত—ওরফে, তোমার আসল নাম বলতে আমার কোন কুণ্ঠা নেই আর—ওরফে কালু সেন—তুমিই হচ্ছ কৃত্তিবাস সেনের হত্যাকারী।'

তবু, তথাপিও থরহরির কপালের একটি শিরাও কাঁপল না। একটি কথাও না বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কান্তিও উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। একটিও কথা না বলে থরহরি কান্তির গালে সজোরে ঠাস করে এক চপেটাঘাত করলেন। সেই থাপ্পড়টাই যেন তার একটি মাত্র কথা। যার পর নাই কথা।

'তার মানে,' কান্তি গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল।

'তার মানে, শ্রীমান কান্তিকুমার মিত্র, তুমি একটা মিথ্যুক।' এই বলে। থরহরি চড়টা তখনও তার গালে চড় চড় করছিল। জ্বলছিল গালটা।

'কেবল মিথ্যুক নও, তুমি আস্ত একটা ধাপ্পাবাজ। কিন্তু কোথায় এসে চালাকি-করছিলে তা টের পাওনি। পীরের কাছে মামদোবাজি চলে না। তুমি যে আসলে কে, তা গোড়া থেকেই আমার জানা ছিল—তোমার গোয়েন্দাগিরির প্রহসন শুরু হবার সময় থেকেই। তুমি জানন্য কিন্তু জেনে রাখ যে তোমার প্রত্যেকটি পদক্ষেপের ওপর লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। কোথায় তুমি যাও, কী করো না করো—তোমার সমস্ত চালচলনের ওপর কড়া নজর ছিল পুলিশের।

'কান্তিকুমার মিত্র আসলে যে কালু সেন ছাড়া আর কেউ না, তা আমাদের অজানা ছিল না। তিন বছর আগে কালু সেন কৃত্তিবাস সেনের গৃহত্যাগ করেছে, আর অজ্ঞাতকুলশীল কান্তি মিত্রেরও ঠিক তিন বছর আগেই সাংবাদিক-রূপে অভ্যুদয়। অতএব কান্তি মিত্র, ওরফে কালু সেন আমার বন্ধু নিহত কৃত্তিবাস সেনের হত্যার জন্য তোমাকেই আমি দায়ী করি, তবে তোমাকে পুলিশের হাতে দেয়া না দেয়া আমার ইচ্ছাধীন। আমার নিজের হাতেই তোমাকে আমি শেষ করতে পারি।' একটানা এতবড় একটা বক্তৃতার পর তাঁর জীবনে এত অধিক বাক্যব্যয়ের বাহুল্য এই প্রথম। থরহরি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাঁর নিজের হাতে সাক্ষাৎ কালু সেনকে আরেকবার মারের চোটে শেষ করার বাসনা প্রবল হলেও তেমন কোন উদ্যম তাঁর দেখা যায় না।

এবার কান্তি মিত্র কুশন ছেড়ে উঠে এসে তাঁর নাকে এক ঘুঁষি লাগাল।— 'মিথ্যাবাদী!' চেঁচিয়ে ওঠে কান্তিঃ 'আমি কালু সেন নই! কক্ষনো না।'

ঠিক সেই মুহূর্তে থরহরির জনৈক ভৃত্য দরজা ফাঁক করে প্রবেশ লাভ করে।

'একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান কর্তা।' সে জানায়।

'কে?' থরহরি জিজ্ঞেস করেন নিজের নাকের শুশ্রূষা থামিয়ে।

'আমি চিনি না, তবে তাঁর এই কার্ড দিয়েছেন।'

থরহরি দত্ত কার্ডটি হাতে নিলেন। কার্ডের ওপরে স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিতঃ—কালু সেন।

কার্ড দৃষ্টে থরহরি এবং কান্তি—দুজনে দুজনের দিকে তাকালো—দুটি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতই যেন।—'কস্ত্বং? তাহ'লে—তাহ'লে কে তুমি—' এটাই যেন প্রশ্ন তাদের।

একটু আগে যেখানে তত্ত্বমসির লড়াই চলেছে, তুমিই সেই—সে ছাড়া আর কেউ না—এহেন উচ্চ দার্শনিকতা দেখা গেছে, কার্ডের পৃষ্ঠে দেগে দেয়া 'কালু সেন'—এই দুটি কথায় তো যেন আলোর উদয়ে মসীর তত্ত্বের মতই তুচ্ছ হয়ে গেল। সোহং-এর আবির্ভাবে তছনছ হয়ে গেল সব।

'লোকটাকে ওপরে নিয়ে এস।' বললেন থরহরি।

মিনিট দুই পরে লোকটা এল। কান্তির শ্যেন চক্ষু কালু সেনকে বিক্ষত করতে লাগল। তার সবুজ-রঙা পোষাক। রোদ-চটা তামাটে মুখ আর লম্বা লম্বা আঙুল দেখলে লোকটা কী কাজ করে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না; জাহাজের খালাসি বলে সহজেই তাকে চেনা যায়।

'বোস।' বললেন থরহরি।

'ধন্যবাদ।' বলল সেই খালাসিঃ 'বসতে পারলে বাঁচি। আর কিছু না, আমার কাঠের পা-টা একটু স্বস্তি পায় তাহ'লে।'

থরহরি আর কান্তি আবার পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল। লোকটার একটা পা কাঠের দেখে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেল, আরো দেখল, যা-তা কাঠ নয়, চন্দন কাঠ—। লোকটা (দয়া করে বা চটে গিয়ে) কারো গায়ে যদি পা ঘষে দেয় তা হলে সেই পদাহত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ গন্ধে ভুর ভুর করবে। এটা কেবল কাঠের সত্য নয়, কঠোর সত্য।

'আমি এডেন থেকে আসছি।' উপবিষ্ট হয়ে কালু জানাল।

ঘাড় নাড়ল কান্তি। 'এখন দেখতে পাচ্ছি।' বলল সেঃ 'থরহরি—থরহরি-বাবু, আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা ভুল। মূলত এটা যে এডেনাগত কাঠের এক পা-ওয়ালা একজন লোকের কাজ, আগেই তা আমাদের ঠাওর করা উচিত ছিল। সে ছাড়া আর কারো কীর্তি নয়। এছাড়া অন্য কাউকে ঠাওর করতে যাওয়াই আমাদের অন্যায় হ'য়েছিল।'

'সমবেত ভদ্রমণ্ডলী—!' কাঠের পা-টাকে আরামে রেখে আরাম কেদারায় নড়ে চড়ে বসে কালু আরাম করেঃ 'আমি আমার জবাবদিহি দিতে এসেছি। আমার স্বীকারোক্তি শুনুন। যদিও সাধারণতঃ পুলিশের শিকার হবার পরই এই উক্তি করাটা দস্তুর। কিন্তু আর সময় নেই। আমি নিজেই আমার শিকার—দুর্ভাগ্যের শিকার। যতদূর মনে হয়, আমার আর বেশী সময় নেই। এখানকার—ঠিক ইহলোকের কিনা জানি না—তবে এখানকার খাঁচা থেকে এখনই আমাকে উড়তে হবে।...যতক্ষণ সময় আছে আমার শেষ কথাটা শেষ করে নিই আগে।'

'সেকি!' কান্তি বিস্ময়ে নুয়ে পড়ে। 'তুমি কি অন্তিম ক্ষণে এসে উপস্থিত হ'য়েছ নাকি? শেষ মুহূর্তে এসে দেখা দিয়েছ আমাদের?'

'তাই কি স্বাভাবিক নয়? সেইটাই ঘটে না কি সচরাচর?' পাল্টা প্রশ্ন এল কালুর দিক থেকে। 'আপনারাই বলুন না!'

'হ্যাঁ, তাই ঘটে থাকে বটে।' কান্তি ঘাড় নাড়ল, 'তাহলে নিশ্চয় তোমার বক্তব্যের মাঝে মাঝে গলার ঘড়ঘড়ানি উঠে তোমাকে বাধা দেবে বোধ হ'চ্ছে? হয়ত বেদম কাশিও আসতে পারে তোমার, তাই না?'

'আপনি সর্বজ্ঞ। আপনাকে নমস্কার!' কালু সেন পা তুলবার চেষ্টা করল, পারল না। অগত্যা কেবল হাত তুলেই নমস্কার জানালো। 'ঠিকই ধরেছেন আপনি—তবে গলার ঘড়ঘড়ানিটা আমি উপসংহারের জন্য রেখেছি। বেদম কাশিটা মাঝে মাঝে আমদানী করব বটে, তবে তার দেরি আছে এখনো।'

'গাল বেয়ে রক্তও গড়িয়ে পড়তে পারে হয়ত? অ্যাঁ?' থরহরির আশঙ্কা হয়, তকতকে মেঝের দিকে তাকিয়ে।

'আজ্ঞে না, অতদূর গড়াবে না।' জবাব দিল কালু; 'এবার তা'হলে আত্ম-জীবনী শুরু করা যাক। বাল্যকাল থেকেই আরম্ভ করি—কেমন?'

'না, না, দোহাই, তা কোরো না।' কান্তি এবং থরহরি সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে। এমনকি এতদিনের ও এত কাণ্ডের পর অকম্পিত থরহরিকেও থরথর কাঁপতে দেখা যায়।

কালু সেন ভ্রূকুঞ্চিত করে। 'আমার ধারণা আমার আত্মজীবনী শোনাবার ন্যায্য অধিকার আমার আছে।' সে বলে—'যে লোকটা একজন লোকের প্রাণ নিয়েছে এবং অপর একজনের মানে, নিজের প্রাণ দিতে চলেছে—প্রাণের আদান প্রদান যার কাছে এমন অকাতর এবং তুচ্ছ—তার যা খুশী সবাইকে শুনিয়ে দেবার অধিকার আছে বই কি। এটা বার্থ রাইট না হতে পারে, কিন্তু ডেথ রাইট যে, তাতে কোনো ভুল নেই। অতএব আমার কাহিনী আপনাদের শুনতে হবে। শুনতেই হবে—না শুনে উপায় নেই।'

'ছোটবেলার থেকেই আমার দুর্দান্ত স্বভাব।' কালু বলতে থাকেঃ 'যখন যা মনে হয়েছে তাই করেছি। তখন-তখনই যদি কেউ শাসন করত আমার স্বভাব শোধরাবার চেষ্টা করত, তাহলে বোধহয়—'

'কিন্তু তা করা হয়নি।' থরহরি বাধা দেন ঃ 'তারপর?'

'আমার কাকার তিনকুলে আমি একাই ছিলাম। আর কাকার ছিল অগাধ ঐশ্বর্য। অপর্যাপ্ত বিলাসের মধ্যে ছোটবেলা থেকে বর্ধিত হয়ে কোনদিন যে আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে বা তার প্রয়োজন হবে, তা আমি কখনো বোধ করিনি।'

'ভালকথা'—কান্তি সবকিছুই চুলচেরা খতিয়ে দেখার পক্ষপাতী, বাধা দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে. 'তখন তোমার ক'টা পা? মানে পায়ের সংখ্যা ছিল কত?'

'দুই, মাত্র দুই। ভগবদ্দত্ত সবার যেমন থাকে। কিন্তু অল্পদিনেই বিলাস-ব্যসনের চূড়ান্তে উঠতে গিয়ে—'

'তোমার পা ফসকালো। মানে একটা পা! কালুভায়া চটপট। তোমার আসল কথায় এসে পড়ো। আমার ভারী খিদে পেয়েছে।'

'এই এলাম।' বলল কালু: 'দেরি নেই. কিন্তু মহাশয়রা যতদূর মনে করছেন ততটা নয়। খারাপ আমি ছিলাম বটে. কিন্তু একেবারে অতিশয় খারাপ কখনই ছিলাম না।'

'না, না, তা তো নয়ই।' থরহরি এবং কান্তি সান্ত্বনার ছলে সায় দিল। 'তা কে বলছে? পরের টাকা এবং দুশ্চরিত্র সকলেই বেশী বেশী দেখে; কিন্তু তাহলেও শতকরা নিরানব্বই জনের চেয়ে বেশী খারাপ কক্ষনোই তুমি ছিলে না।'

'এমনকি আমার জীবনেও ভালবাসা দেখা দিয়েছিল। যেমন প্রত্যেকের জীবনেই দেখা দেয়। কিন্তু প্রত্যেকের জীবনে ভালবাসা এলেও ঠিক তেমন-ভাবে আসে কি না সন্দেহ আছে। তেমনটি আমি কখনো দেখিনি। এ জেনেও না; এমন কি কোনো রাতেও নয়। তাকে দেখলে মনে হয় যেন মূর্তিমতী করুণা। সেই কাশির মহিষী করুণার মতই। সে যেমন গরীবদের কুটিরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, ইনিও তেমনি এই গরীবের মনে—বেশী আর কী বলব? যেন রবীন্দ্রনাথের সেই আনন্দময়ী মূরতি 'তোমায় কোন দেব তুমি আনিলে দিবা?' তিনবছর আগে সেই করুণা আমার কাকার বাড়িতে এল—'

'জানি. জানি। টাইপিস্টরূপে।. তারপর?' কান্তি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

'এবং নাম তার করুণা নয়। মিস অলকা দত্ত।' থরহরি মনে করিয়ে দেয়।

'তারপর আমি তাকে না ভালবেসে পারলুম না। প্রথমে বোনের মত—তারপর বন্ধুর মত—তারপর—'

'তারপর যৎপরোনাস্তি ঠিক যেমন হয়ে থাকে।' তারপরে? 'তারপরের মোদ্দা কথাটা আমরা শুনতে চাই।' থরহরি বললেন, 'যদি বলতে চাও তো বল।'

'তারপর তাকে নিয়ে আমি সিনেমায় গেলাম। আমার কাকা. কি করে জানি না. টের পেলেন সেটা। সিনেমার ওপরে তিনি হাড়ে চটা ছিলেন। সিন আর সিনেমা তাঁর ধারণায় ছিল এক জিনিষ, এমনকি সহিস কোচম্যানদেরও তিনি সিনেমা দেখার ছুটি দিতেন না—পাছে তারা ঘোড়াদের বখিয়ে ঘোড়েল করে দেয়—'

'ঘোড়ার কথা থাক.' কান্তি বলল, 'তোমার কথা বল। কাকা ঐ কাণ্ড টের পাবার পর কী হল শুনি?'

'ভারী তিনি চটে গেলেন। এমন কি ঐ নিয়ে আমাদের মধ্যে ভীষণ কলহ পর্যন্ত হ'য়ে গেল। শেষে তিনি আমাকে ত্যজ্যপুত্র করে দিলেন—'

'ত্যজ্য ভ্রাতুষ্পুত্র। সঠিক বললে তাই নয় কি?' কান্তি ভ্রম সংশোধন করে।

'ত্যজ্য ভ্রাতুষ্পুত্র করে তাঁর অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করে তাঁর বাড়ি থেকে তিনি বার করে দিলেন আমায়।'

কাল্লু থামল, এইবার তার সেই পূর্ব প্রতিশ্রুতি কাশির ধমকানি দেখা দেবে বলে কান্তি মিত্রের ধারণা হয়। থরহরি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে নিজের সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। বোধহয় এই তাঁর জীবনের প্রথম দীর্ঘ নিশ্বাস। নিজের জন্য যা কখনই তাঁকে ফেলতে হয়নি, কোন কারণ ঘটেনি ফেলবার; অন্যের গৃহতাড়িত হবার দুঃখে অনেকদিনের সযত্ন-সঞ্চিত সেই দীর্ঘশ্বাস এই সুযোগে মোচন করার অবকাশ পেয়ে তিনি পরিত্যাগ করেন।

কাল্লু সেনও দীর্ঘশ্বাস ফেলে আরম্ভ করে আবার : 'ছোটবেলায় আমার আরেক ভালবাসা ছিল। শিশুর থেকে আমি সমুদ্রকে ভালবাসতে শিখেছিলাম।'

'কোন শিশুর থেকে?' কান্তির সাগ্রহ প্রশ্ন।

'রবীন্দ্রনাথের শিশু বইটির থেকে নয় নিশ্চয়ই?' থরহরিও জানতে চান।

'সমুদ্রের প্রতি টান আমার ছোটবেলার। নৌকা দেখলে তার পালের আগে আগে ছুটতাম।'

'নৌকোর পাল?' কান্তি আরো অবাক হয় এবার। 'তোমার সামুদ্রিক পরিভাষা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। নৌকোর পাল আবার কীহে? নৌকোরাও কি গরুর মত পালে পালে চরে নাকি? আর চরলেও, তাদের আগে না ছুটে পেছনে পেছনে দৌড়নোর কী বাধা ছিল তোমার?'

কাল্লু সেন কান্তির কথার কোন জবাব দিতে পারে না। কাশতে আরম্ভ করে। জবাব দিতে পারে না বলেই কাশীবাস শুরু করে বোধহয়। কিংবা প্যাঁচে চাপা পড়েই বোধহয় সে নিরুত্তর হয়ে যায়। 'বোম্বে থেকে আসবার পথে কি তুমি কাশীধাম ঘুরে এসেছিলে নাকি হে?'

কান্তির জানার কৌতূহল হয়।

'তোমার এই কাশির ধমক দেখে সন্দেহ হয়।' কান্তি জানায় : 'কাশী প্রাপ্তির জন্যই লোকে সেখানে গিয়ে থাকে বলে শুনেছি। আর, সেখানে গেলে স্বভাবতই কাশীপ্রাপ্ত হ'তে হয় শেষ পর্যন্ত।'

কাল্লু কোনো জবাব দিতে পারে না। বিনা বাক্যব্যয়ে কাশতে থাকে।

'তোমার এই কাশি কি গয়ায় পর্যন্তও গড়াবে নাকি?'

তকতকে মেঝের দিকে তাকিয়ে থরহরি আতঙ্কিত হন। 'কাশী গয়া সব এক পথেই পড়ে না? এক লাইনেই যাওয়া যায় তো?'

কাল্লু তার কাশির মাঝখানে, খানিকক্ষণের জন্যই যেন, এক হলটিং স্টেশনে এসে দাঁড়ায়।

কাশি থামিয়ে কাল্লু জানায় : 'কাশির কথা থাক্। পালের কথা কী শুধুচ্ছিলেন? সব পালাটা শুনুন আগে। কাকা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে আমার সেই বাল্যকালের ভালবাসা মনে পড়ল। সমুদ্রকে আমি ভালবাসতাম। শিশুপাঠ্য বই পড়ে যে ভালবাসা জন্মেছিল, সিনেমায় সমুদ্রের ছবি দেখে ক্রমে ক্রমে তা বেড়ে উঠেছিল ক্রমে ক্রমে। একটা জাহাজে খালাসির কাজ নিয়ে

যেদিকে দ্'চোখ যায় বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম আমি যবদ্বীপের দিকে। সেখানে মালয় উপকূলের এক সামুদ্রিক ডাকাত আমার একটা পা ছিঁড়ে নিল। ভাগ্যিস মালয়ের বনে চন্দন সস্তা, প্রায় হিমালয়ের বরফের মতই সুলভ! তাই আসল পায়ের চেয়েও দামী, চন্দন কাঠের এই মূল্যবান পদ আমি লাভ করেছি।'

'তুমি তো মরতেই যাচ্ছ। যখন তোমার অন্তিমক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে তখন শেষ পর্যন্ত তোমাকে মরতেই হবে। যদি কিছু না মনে কর তাহলে স্মরণচিহ্ন স্বরূপ তোমার এই পা থেকে একটুখানি আমি কেটে নিতে চাই। আমার এক পিসির ভারি পুজো-আর্চার বাতিক, তিনি পেলে খুশি হবেন খুব। কেটে নিলে তোমার লাগবে না তো?' কান্তি জিজ্ঞেস করে।

'পায়ে লাগবে কিনা জানি না। তবে, মনে লাগবে। কত কষ্ট করে এই পা বানানো, তা জানেন!' কালু জানায়।

'তবে থাক, থাক। দরকার নেই।'

'এইবার আমি সেদিনের ঘটনায় আসব। কিছুদিন আগেকার সেই ঘটনায়। আমার কাহিনীকে আর অযথা বাড়াতে চাই না। থরহরি বাবুর বোধ হয় খাবার সময় হয়েছে, খিদেয় ছটফট করছেন মনে হচ্ছে। এক কথায় সেরে ফেলব এবার। তিন বছর আগের কথাই বলছি—আমরা মালয় থেকে পাত্তাড়ি গুটিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে রওনা দিলাম। তারপরে এই আড়াই বছর ধরে নানা দেশের নানান উপকূলে নানাবিধ জীবনযাত্রা দেখেশুনে অবশেষে একদিন এডেন হয়ে আমাদের জাহাজ বম্বে বন্দরে এসে পৌঁছল।'

'আমরা জানতাম।' বলল কান্তি।

'আপনাদের অজানা কি আছে? গোয়েন্দারা কী না জানেন? তারপর যা বলছিলাম। বম্বেতে জাহাজ এলে আমি কিছু দিনের ছুটি নিলাম। ছুটি নিয়ে রেলে চেপে চলে এলাম এই কলকাতায়......খক্ খক্ খক্।'

'আসবার পথে কি তুমি কাশী হয়ে এসেছিলে নাকি?' কান্তি বাধা দিয়ে তার আগের কথাটাই শুধোয় আবার।

'কাশী? না তো! কাশী হয়ে আসিনি—এসেই কাশি হল। এই মারাত্মক কাশিটা—তারপর যা বলছিলুম।'

'কথা ছিল, বম্বে থেকে আমাদের জাহাজ কলকাতার ডকে যেমনি এসে ভিড়বে, তেমনি আমারো ছুটি ফুরোবে। আমি এখান থেকেই জাহাজে আমার কাজে যোগ দেব! আমি দেখলাম এই সুযোগ—।'

'খুড়োর গঙ্গাযাত্রা করানোর। তাই না?' কান্তিও যোগ দেয়।

'ঠিক ধরেছেন!......কলকাতায় আমার ভূতপূর্ব বাড়িতে ফিরলাম বটে, কিন্তু কী গেছলাম আর কী হয়ে এলাম। তিক্ত মন, আশাহীন জীবন, রিক্ত দেহের ভগ্নাবশেষ নিয়ে একা ফিরে আসা! কেবল একমাত্র এই চিন্তা তখন আমার মনে ছিল—আমার সর্বনাশের জন্য যিনি দায়ী, মূল কারণ আমার

সেই কাকাকে এবার খতম্ করে যাব।'

আবার দ্বিতীয়বার কাশিটা এসে ধমক দিতে লাগল কালুকে। কাশতে কাশতে অস্থির হয়ে পড়ল বেচারা। থরহরি আর কান্তি উভয়ে উভয়ের দিকে কটাক্ষ করলেন। যার মর্ম হচ্ছে, লোকটি কি শেষ কথা বলার আগেই বলা শেষ করবে নাকি? খকখকানি যে থামেই না আর!

অবশেষে থরহরিবাবু না বলে পারেন না,—'তোমার কাকাকে তো নিকেশ করেইছো, কিন্তু তাঁর শেষ কাণ্ডটা বর্ণনার আগে নিজে যেন খতম হয়ো না।'

'ক্ষান্তি দাও কাশির।' কান্তিরও অনুরোধ।

'আমি কি ইচ্ছে করে কাশছি নাকি?' কালু বলে—'ইচ্ছে করলে হাসা যায়। এমন কি অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাসতে পারে মানুষ।'

'তাকে বলে কাষ্ঠ হাসি। জানি,' কান্তি জানায়।

'কিন্তু আমার এটা কি কাষ্ঠ কাশি বলেই আপনাদের বোধ হচ্ছে?'

'না না, তা বলছি না, তবে এটা তোমার কাশির পরাকাষ্ঠা বটে। কান্তি বলে—কিন্তু কাশতে কাশতে কাঠ হয়ে যাওয়া এতটা কি ভালো?'

'আমি কোথায় কাঠ হয়েছি? আমার একটুখানিই তো হয়েছে। এই পা-টা কেবল।'

কালু আকাঠের মতই নিজের পা তুলে দেখায়। নিজেই নিজের পদোন্নতি ঘটায়।

'তোমার যে বেশ পায়াভারী তা আমাদের আর জানতে হবে না।' বলেন থরহরিবাবু: 'তা আমাদের অজানা নয় ভাই।'

জবাবে কালু আবার তার কাশি বাজায়।

কাশির ধমকানি শেষ হলে কালু সেনের সুরু হল আবার: 'সন্ধ্যের পর অন্ধকার বেশ জমাট হয়ে এলে আমি কাকার বাড়ির মাটিতে পা দিলাম। রাত তখনো বেশী হয়নি; কিন্তু কাকার প্রিয় ভৃত্য উদ্ধবের টিকি দেখা গেল না। তাতেই বুঝলাম, কাকা বেরিয়েছেন। কাকা বাড়ির গাড়িতে বেরোননি তা বোঝা গেল। কেননা গাড়ি ঘোড়া আস্তাবলেই মজুদ ছিল, কিন্তু তা থাকলেও সহিস কোচম্যানরা কেউ ছিল না। একটা ঘোড়া আমাকে দেখে চিনতে পারল কিনা জানি না, কিন্তু হ্রেষারবে সেই প্রথম আমাকে স্বাগত জানালো।'

সদর দরজা খোলাই পড়ে ছিল; ইচ্ছে করলে স্বচ্ছন্দে সেই পথেই বাড়িতে ঢুকতে পারতাম। কিন্তু যে খুন করতে এসেছে তার ওভাবে গৃহে প্রবেশের কোন মানে হয় না। ঝোপ ঝাড়ের আড়াল আর আবডাল থেকে কাজ সারাই তার সংগত মনে হয়। কিন্তু কাকার বাগানবাড়ি, নামেই বাগানবাড়ি। বাগান সেখানে নামমাত্র, ঝোপঝাড়ের অস্তিত্বই নেই। কিন্তু যেখানে ঝোপঝাড় নেই, আর যখন সদর দরজা খোলা এবং কেউ নেই কোথাও, তখন কী করি? অগত্যা আমার কাঠের পায়ার সাহায্যে বাধ্য হয়ে দেয়াল বেয়ে উঠতে হল আমাকে। অসাধারণ সাহসে ভর করে তাই উঠলাম। তা ছাড়া পথ ছিল না। দোতালা পর্যন্ত উঠে

একটা জানালা পাওয়া গেল। কাকার বিলিয়ার্ড ঘরের জানালা। জানালার কার্নিশে বসে অসাধারণ কৌশলে তার ভেতরের খিলটা খুললাম। কৌশলটা আর কিছু না, ছুরি দিয়ে খড়খড়ি দু'ফাঁক করে হাত গলিয়ে ভেতরের ছিট-কানিটা খুলে ফেলা। ইচ্ছে করলে সদর দরজায় এগিয়ে অনেক আগে বিলিয়ার্ড ঘরে পেঁৗছে ভিতর থেকেই জানালাটা খুলতে পারতাম ঢের সহজেই। কিন্তু কার্নিশে বসে খোলাটাই অসাধারণ। অন্যভাবেও খোলা যেত বটে, কিন্তু কাজটা নিতান্ত খেলো হয়ে যেতো। পরদিন পুলিশের লোকেরা এসে কিসের এত অনুসন্ধান করত তাহলে? ক্লু খুঁজত কোথায়? অনুসন্ধান করার মত কিছু না পেলে তারা খুব বিরক্ত হ'ত না কি? ভাবত যে, আমি তাদের ডুবিয়ে দিয়েছি, তাদের সংগে ঠিক সদ্ব্যবহার করিনি, আমার উপযুক্ত কাজ করিনি। মনে মনে তারা টিটকিরি দিত আমাকে। এইসব দিকে দৃষ্টি রাখা দায়িত্বজ্ঞানী হত্যাকারীর কর্তব্য। খুনখারাপির পথ অত্যন্ত সোজা, সহজেই খুন করা যায়, কিন্তু ইচ্ছে করেই আমরা সেটা ঘোরালো করে তুলি, তার মধ্যে ঘোর প্যাঁচ না থাকলে কিছুই থাকলো না। কোন মারপ্যাঁচ না করে যদি মারা যায়, তাহলে সেটা মারাই হল না। খুনের অভিধানে সেটা নিতান্তই অপকর্ম।'—

কান্তি হাঁ করে কালুর মুখ থেকে এই হত্যা-রহস্য শুনছিল—থরহরি তাদের দুজনকেই বাধা দিলেন। 'ঢের হ'য়েছে। আসল কথা শুনি এবার।' তিনি বললেন। 'এইবার নিয়ে তিনবার।'

রান্নাঘর থেকে ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ এসে অনেকক্ষণ থেকে তাঁকে বিব্রত করছিল। না বলে তিনি থাকতে পারলেন না। 'জানালা খুলে ফেলে তারপরে আমি বিলিয়ার্ডের ঘরে পা নামালাম। খুনের নেশায় বুকের রক্ত তখন টগবগ করছে আমার। কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ, আমাকে তিনি খুব বাঁচিয়েছেন। খুন আমাকে করতে হয়নি—'

'অ্যাঁ, এই যে বললে তুমিই খুন করেছ? এখন আবার?' কান্তি চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই উলটো গাইছো কেন?'

'এখনো আমি কিছুই বলিনি। করেছি কি করিনি, আমার কাহিনী শেষ হ'লে আপনারাই তার বিচার করবেন। করেছি কি করিনি আমি নিজেও আজও জানি না। আমি নিজেও তা জানতে চাই। আপনাদের কাছ থেকেই জানতে হবে আমায়। আপনারাই তার বিচারক—'

'আহা বলতেই দাওনা ওকে। তুমি আবার কেন বাধা দিচ্ছ?' বাধা দিয়ে থরহরি স্বয়ং এবার বললেন। বললেন কান্তিকেই।

'হ্যাঁ, যেমনি না আমি বিলিয়ার্ডের ঘরে পা দিয়েছি তক্ষুনি সেই ঘরের বিজলি বাতি জ্বলে উঠল, আর আমার চোখের সামনে দেখতে পেলাম—কাকে দেখতে পেলাম তা আমি বলব না—তা আপনারা আমাকে খুনই করুন আর ফাঁসিই দিন, সেই দেবীর বর্ণনা আমার এই পাপ মুখে আমি করব না। সেই দেবী বললেন,—দেবীদের অজানা কী আছে? সকলের নাড়ির খবর তাঁদের

হাঁড়িতে—মন্দ্র কণ্ঠে তিনি বললেন আমায়—'পিলটু, বুঝতে পেরেছি। তোমার কাকাকে খুন করতে এসেছ। ওকাজটি করো না। দেবীর ঐ কথায় আমার মন ঘুরে গেল। মত বদলে গেল আমার। আমি হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলাম ঠিক যেমন করে—যেমন করে—'

ভাষায় কুলিয়ে উঠতে না পেরে কালু সেনকে থামতে হয়। থরহরি দাড়ি চুলকোল।

'ঠিক যেমন করে বোকারা আর খোকারা কাঁদে।' কান্তি বাৎলে দেয়। 'তারপর?'

কান্নাকাটি শেষ হ'লে নীচের থেকে কাকার গলার আওয়াজ এল। 'চট্‌পট্‌' বললেন সেই দেবী, 'চট করে কোথাও লুকিয়ে পড়ো। উনি যেন তোমায় দেখতে না পান।' এই বলে দেবী পাশের ঘরে পালিয়ে গেলেন। আমি চার ধারে তাকিয়ে কেবল একটি তাক দেখতে পেলাম। বেশ বড়ো তাক—পর্দা দিয়ে ঢাকা। পর্দার আড়ালে কোন রকমে তার মধ্যে গুড়িসুড়ি মেরে লুকিয়ে থাকা যায়। আমি সেই তাকে গিয়ে উঠলাম। কী করে উঠলাম বলব?'

'না, নিজেই আমি মাথা ঘামিয়ে বার করতে পারব।' কান্তি জবাব দিল—'ষন্দুর মনে হয়। তোমার ঐ কেঠো পা দিয়ে একলাফে উঠে গিয়ে দাঁড়ালে? অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সাহায্যেই- তাই না?'

কালু সেন জবাব দিল পা নেড়ে, সেই কেঠো পা-খানাকেই নেড়ে চেড়ে জানালো যে, তাই বটে।

'তারপর, তোমার পর্দানসীন হবার পর?'

জিজ্ঞেস করে কান্তি।

'অ্যাঁ?'

'মানে বল্‌ছিলাম কি, পর্দা মানেই তো নো সীন—কোন দৃশ্য নেই। কেননা, পর্দার ভেতব দিয়ে তো কিছুই আর দেখা যায় না।'

'কেন দেখা যাবে না? প্রতিবাদ করল কালু—বলেছি না পর্দার মাঝখানে একটা ছ্যাঁদা ছিল? সেই ছিদ্র পথে ঘরের সব কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম।

'মানুষমাত্রই ছিদ্রান্বেষী। কে না জানে?' সায় দেন থরহরি।

'আচ্ছা, বলে যাও এবার।' কান্তির উৎসাহদান।

'পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম কী হয়। কাকা এলেন, থরহরিবাবু এলেন। কাকা বললেন, 'এস থরহরি একবাজি খেলা যাক।'

থরহরি জানালেন যে, তাঁর আপত্তি নেই। এক পেট গেলার পর বিলিয়ার্ড খেলায় নাকি হজমের সাহায্য হয়। এই নাকি তাঁর ধারণা।

তারপর দু'জনেব খেলা শুরু হ'ল।

'আমি ওদের খেলা লক্ষ্য করতে পারলাম। পর্দায় একটি ছ্যাঁদা ছিল—বলেছি না? তার ভেতর দিয়ে নিজে অদৃশ্য থেকেও সমস্ত কিছু দিব্যি দেখা যায়—'

কান্তি বলল—হ্যাঁ পর্দার ছ্যাঁদাটা আমি দেখেছিলাম বটে। যদিও ছ্যাঁদার

ভিতর দিয়ে কতদূর দেখা যায় তা লক্ষ্য করতে যাইনি।'

'ওই তো গোয়েন্দাদের গলদ। আসল লক্ষ্য ফেলে উপলক্ষের পিছনে আপনারা ছোটেন। যাইহোক, দেখতে লাগলাম খেলাটা। খেলা কিন্তু আর শেষ হ'তে চায় না। এদিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার পা টনটন করতে লেগেছে। দুটো পা-ই। খেলতে খেলতে দু'জনে খুব মেতে উঠলেন এবং দেখতে না দেখতে তেতে উঠলেন দু'জনেই। অবশেষে ঐ খেলা নিয়ে ঝগড়া বেধে গেল দু'জনার। থরহরিবাবু হেরে গেছলেন।' কালু ফাঁস করে দিল।

থরহরিবাবু ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলেনঃ—'সে যে সেই সাদা বলটাকে—' তার বেশী তিনি আর বলতে পারলেন না। এতদিন পরেও সেই কথা ভাবতে গিয়ে ভাবাবেগে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে এলো।

'ঠিক কথাই।' কালু বললঃ—'আমার কাকা লাল বলটা মারতে পারেননি। তাঁর ফসকে গেছল। কান্তি বাবু, ভাবত বিলিয়ার্ডের গবেষণাই তোমার ভুল। আগাগোড়াই গলতি। বিলিয়ার্ড খেলায় শেষ পয়েণ্ট নিয়ে কেউ ব্যস্ত হয় না। তখনো টেবিলে দু'জনের নিরানব্বই। থরহরিবাবু টেবিল ছেড়ে চলে গেলেন। আমার কাকা তারপরও লাল বলটাকে মারবার তাক করতে লাগলেন। একলা একলা সব বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়েই যা করে। আধখানা মারে বলটাকে টপকে নিয়ে গিয়ে টেবিলের পকেটজাত করা—সেই চেষ্টাই তিনি করতে লাগলেন বারম্বার। কিন্তু কিছুতেই পারছিলেন না। কত রকম ভাবে তিনি করলেন। কিন্তু কিছুতেই বলটাকে কাবু করতে পারলেন না তবুও।

'এই চেষ্টায় ক্রমশঃ তিনি দুর্বল হ'য়ে পড়লেন বোধ হয়?' কান্তি জিজ্ঞেস করল। খুঁটিনাটির দিকে তার খর নজর।

'মোটেই না'—অবশেষে তিনি করলেন কি...আমি সেই পর্দার ছিদ্র ভেদ করে দেখতে লাগলাম—অদ্ভুত এক কাণ্ড করলেন। পকেট থেকে রুমাল বার করে গলায় জড়ালেন, ফাঁসের মত করে জড়ালেন, আর সেই ফাঁসের মধ্যে বিলিয়ার্ডের কিউটাকে রাখলেন। 'এইবার বোধহয় আমি পারব।' তিনি বললেন, 'এইবার।'

'হ্যাঁ, এবার আমি বুঝতে পারছি।' বলল কান্তি।

'হ্যাঁ, এবার পারবেন।' কালু বললঃ—গলায় কিউ বেঁধে বলটার পশ্চাতে তিনি লাগলেন এবার। খুব উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে, বুঝতেই পারছেন। খেলা দেখতে দেখতে আমিও ভারী উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। কোথায় আছি; কী অবস্থায় আছি, কিছুই আমার খেয়াল ছিল না। কাকার মারটা দেখবার জন্য পর্দা ফাঁক করে ঝুঁকে দেখতে গেছি—আমার কাকা তখন তাক করছেন, আর একদৃষ্টে তাকিয়ে আমি। আমাদের এই তাকাবার মুহূর্তে তাক থেকে আমার পা ফসকে গেল। কাকা ছিলেন আমার সামনে, আমি তাঁর ঘাড়ে গিয়ে পড়লাম। [illegible] আমাকে নিয়ে তিনি পড়লেন। পড়লেন গিয়ে মেঝের।'

[illegible] কান্তি : 'উপুড় হয়ে তিনি পড়লেন আর তাঁর

মাথা ঠুকে গেল মেঝেয়। আর গলার ফাঁসে আর কিউয়ে আটকে গিয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু ঘটল! বিলিয়ার্ডের লাঠি আর রুমালের ফাঁস এরাই হোলো তাঁর মৃত্যুর কারণ বুঝতে পারছি এখন।'

'হুবহু তাই।' কালু জানালো। 'তারপর যখন আমি এই দৃশ্য দেখলাম, দেখলাম যে তিনি অক্কা পেয়েছেন আর একদণ্ড সেখানে দাঁড়াবার আমার সাহস হল না। কিউটাকে ছাড়িয়ে এসে কাকার গলার ফাঁসটা আরো ভালো-ভাবে আমি এঁটে দিলাম। হাতদুটো বিবেকানন্দের স্টাইলে সাজিয়ে রাখলাম। ওই স্টাইলটাই আমার ভারী ভাল লাগে। ওতে বুকে জোর পাওয়া যায়। তারপর যেমন এসেছিলাম তেমনি বেমালুম সে স্থান থেকে প্রস্থান করলাম।'

'তেমনি দেয়াল বেয়ে? না, জানালা ডিঙিয়ে?' কান্তি প্রশ্ন করল।

'না, এবার সদর পথেই। খুন করলে অবশ্যি অন্য পথ ধরতে হত আমায়।'

'কিন্তু পিন দিয়ে তোমার কাকার বুকের কাছে গাঁথা সেই কাগজখানা? যাতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার তোমার নামে উইল করে লিখে দেয়া হয়েছে—সেটার কথা তো কিছু বললে না হে?'

'কী কাগজ? কই, আমি তো তার কিছুই জানি না। তেমন কিছুই তো আমি লিখিনি। সে সব লেখবার কথা আমার মনেও ছিল না। আমি তখন সেখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।'

'তুমি না লিখলে কে আবার তবে লিখবে? তবে কি আমি লিখেছি?' কান্তি এবার চটে ওঠে; তার ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না বলেই বোধহয়।

'তাহলে—তাহলে কি সেই দেবী—সেই দেবীই নাকি?' কালু সেন এই পর্যন্ত বলেই চেপে যায়।

'তা হতে পারে। দেবীদের অসম্ভব কিছুই নেই।' থরহরি বলেনঃ 'দেবী-দের রহস্য সাক্ষাৎ দেবতারাও টের পান না ভায়া।'

'তোমার কাকার ঐভাবে মারা যাওয়াটা দৈব-দুর্ঘটনা হতে পারে—কিন্তু ওই কাগজের লেখাকে আমি দেবী মাহাত্ম্য মনে করে তোমার কথা মানতে আমি প্রস্তুত নই। কান্তি জানায়।

'কালু, গল্পটা তুমি বানিয়েছ মন্দ না।' খানিকক্ষণ ভাবিত থেকে থরহরিবাবু বললেন : 'এ পর্যন্ত যত খুনের কেচ্ছা পড়েছি...'

তড়বড় করে বলে যান থরহরি—

'আর আমার কাগজে—বেরিয়েছে, তার সবগুলোকে টেক্কা দিয়েছ নিঃসন্দেহ। কিন্তু তবু তোমার গল্পের এক জায়গায় গলদ আছে—একটা কথা কিছুতেই আমি বুঝতে পারছি না। তোমার কাকার গায়ে যে দুটি বুলেটের দাগ দেখা গেছে—তার মানে কি? গুলির ওই গর্তদুটো এল কোথা থেকে?'

'সেকেলে কালের গর্ত। বহু পুরানো।' কালু ধীরে ধীরে [illegible] আমার সঙ্কোচ হচ্ছে: কিন্তু আপনারা না বলিয়ে ছাড়[illegible] আগে আমার কাকা একজন বড় দরের [illegible]

সর্দার ছিলেন তিনি। সেই সময়ে পুলিশের অনেক গুলি তাঁকে হজম করতে হ'য়েছে। পুলিশের পাল্লা থেকে পালাতে গিয়ে কতবার যে তিনি গুলি খেয়েছিলেন তার ইয়ত্তা হয় না। তার সারা দেহ অমন অনেক গুলিতে ঝাঁঝরা। বয়স বেশী হয়ে গেলে আর অতটা ঝুঁকি নেওয়া তাঁর পোষাল না। অত ঝুঁকি নিয়ে অর্থোপার্জনে শেষ পর্যন্ত মজুরী পোষায় না। তার চেয়ে সোজাসুজি আইনসংগত উপায়ে টাকা কামানোর দিকে তাঁর নজর পড়ল। তিনি বলতেন কেন আইন বাঁচিয়ে কি চুরি ডাকাতি করা যায় না? আইনের জোরে কী না হয়। এবং তার পরেই তিনি কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হয়ে গেলেন। তিনি বলতেন গুণ্ডার সর্দারির চেয়ে মিউনিসিপ্যালিটির মুনসীআনিতে বেশী লাভ অথচ প্রায় একই ব্যাপার নাকি—একই ওস্তাদির রকমফের কেবল।

এমন কি তিনি আরো বলতেন যে পরমহংসদেব যেমন সব ধর্মের সমন্বয় করেছিলেন—সর্বধর্মসমন্বয় করতে পারলেই কাউন্সিলার হওয়া যায়। কর্পোরেশনের তাঁরা এক একটি পরম পুরুষ। কর্পোরেশন থেকে লাটের দরবারে এমন কি বড়লাটের দরবারে এমন কি মন্ত্রিসভার খাস কেবিনেটে যাবার পর্যন্ত তাঁর লোভ হয়েছিল। সে সব জায়গার ব্যাপার নাকি আরো বড়দরের তিনি বলতেন। কিন্তু সে বাসনা চরিতার্থ করবার তিনি আর ফুরসৎ পেলেন না। আমার মুহূর্তের পদস্খলনের জন্যই তাঁর সেই আকাঙ্খা অপূর্ণ থেকে গেল। কালু সেন দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করল এই বলে।

'একেই বলে একের পাপে অন্যের পতন। কান্তি মিত্রের মন্তব্য শোনা যায়।

কালু সেন নীরব। সকলেই চুপচাপ, কারো মুখে কথাটি নেই। অবশেষে কালুই স্তব্ধতা ভাঙ্গল।

'মশাইরা আমার সময় খুব কম। (আবার এক কাশির ধাক্কা এল) আমার মনে হয় আমি বুঝি ভেঙ্গে পড়ছি। ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছি আমি। মৃত্যুমুখেই উপনীত হয়েছি বোধ হয়। খবহরিবাবুর বাড়িতে মরা পড়ে তাঁকে আবার নতুন করে আরেক দায়ে জড়াতে আমি চাই না। যেটুকু অল্প সময় হাতে আছে তার মধ্যেই এখান থেকে কোন রকমে এই মুমূর্ষ দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আমি চলে যেতে চাই। কিন্তু নির্দোষ এবং কলঙ্কমুক্ত হয়ে এখান থেকে আমি যেতে পারি কিনা সেই কথাই আমি ভাবছি এখন।'

তুমি নির্দোষ এবং নিরপরাধ।' খবহরিবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বললেন এবং খাবার ঘরের দিকে চললেন সটান।

কালু সেনের কলঙ্ক মোচনের পর দিন কয়েক কেটেছে। এই ক'দিন ধরে [illegible] কেবলই ভেবেছে কী করবে। মিত্রতার পরিধি আরো বাড়াবে কি না [illegible] অবশেষে আজ সকালে কাঁচির কাপড়ের ওপর সিল্কের [illegible] ছড়িয়ে সেই গুরুতর সমস্যাটার মুখোমুখি [illegible] দেখতে যখন সুশ্রীই, অন্তত

আপাত দৃষ্টিতে এমন কিছু অরুচিকর নয়, তখন তার সামনা সামনি হতে পেছপা হবার কি আছে? প্রয়োজনই বা কী, এই কথাই কান্তি ভাবল।

এবং এই ভেবেই সে অলকা দত্তর দ্বারদেশে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। কিন্তু তখনো তার ভাবনা তাকে ছাড়েনি। কড়া নাড়বে কি নাড়বে না? কড়ার আওয়াজ করা উচিত হবে কি? এমন কড়াকড়ি......? এই সব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তখন।

- কান্তি মিত্র রোয়াকের ওপর বসে পড়ল, ভাবতে ভাবতে। 'এই যে কাজ করতে যাচ্ছি, এর পরিণামে আমার ভাবী জীবন কি সুখময় হবে?' এই কথা সে জিজ্ঞেস করেছে। পুনঃ পুনঃ নিজেকেই তার এই প্রশ্ন।

ভেবে দেখলে আমি কৃত্তিবাসের চেয়ে বেশী হঠকারিতা করতে চলেছি। সে নিজের গলায় বিলিয়ার্ডের কিউ বেঁধেছিল আর আমি জলজ্যান্ত একটি মানুষকে আমার গলায় বাঁধতে যাচ্ছি। ভালো করছি কিনা জানিনে।' কান্তি ভাবনায় পড়ে।

'আস্ত একটা মানুষকে গলগ্রহ করে সংসার সমুদ্রে সাঁতার দেওয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব হবে? খোদাই জানেন।' এমন কথাও ভাবছে কান্তি।

'নাঃ, আর ভাবব না। কৃত্তিবাস যদি একজনের গলায় ফাঁস লাগাতে পারে—তাহলে আমি কেন দুজনের গলায় লাগাতে পারব না? আমি কি তার চেয়ে কোন অংশে কিছু কম?'

'না, আমি তেমন কাপুরুষ নই।' অবশেষে সেই স্বগতোক্তি করে কান্তি মিত্র উঠে পড়েছে। রোয়াক থেকে উঠে কড়া বাজিয়েছে দরজায়।

দরজা খুলে যেতেই জিজ্ঞেস করেছে ঃ 'অলকা দেবী আছেন?'

একটি আধবয়সী মেয়ে বেরিয়ে এসেছিল। 'অলকা কালকে এখান থেকে চলে গেছে।' সে বলল।

'চলে গেছেন? কোথায়?'

কান্তি মিত্রের মনে হয় এবার আর রকের ওপরে নয়, পথের ওপরেই যেন বসে পড়েছে সে। নিজেকে ধরাশায়ী বলে তার মনে হতে থাকে।

'তা তো বলতে পারব না।' উত্তর এসেছে মেয়েটির কাছ থেকে।

'আপনি কে? আপনি কি এখানকার—?' কান্তি জিজ্ঞেস করে।

'আমরা এই বাড়ির অন্য ভাড়াটে। অলকার সঙ্গে আমার ভাব ছিল। আপনি কি কান্তিবাবু? সেই রকমই যেন মনে হচ্ছে। তাহ'লে আপনার নামে একটি চিঠি আছে। অলকার চিঠি।' বলে মেয়েটি চলে যায় ঃ 'দাঁড়ান, এনে দিচ্ছি।'

চিঠি না নিয়ে কান্তি মনে মনেই পড়লঃ—

প্রিয় কান্তিবাবু,

পিলটু আর আমি গতকল্য আইনমতে পরস্পরকে [illegible]
চিনতে পারবেন আশা করি। তার ভাল [illegible]
জাহাজে চড়ে এডেনের দিকে [illegible]

হাড়বে। বসোরায় গিয়ে বাসা বাঁধবার বাসনা আমাদের—সেই বড় বড় গোলাপের দেশে।

আপনি শুনে খুসি হবেন পিলটুর কাশি এখন অনেকটা কম। চ্যবনপ্রাশ খাওয়াচ্ছি—কল্পতরুর চ্যবনপ্রাশ। কাশির পেয়ারা খেলেও সারত, ও বলছিল। কিন্তু তা আর পাচ্ছি কোথায়? তবে বোগদাদের আঙুর খেলে সেরে যাবে আশা হয়।

আরো সুখের বিষয়, কৃত্তিবাস সেনের এ্যাটর্নিরা তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পিলটুকে দিতে ইতস্তত করেন নি। কেন না যে কাগজখানা নিহত কৃত্তিবাস সেনের বুকে আঁটা দেখা গেছল, সেটা নাকি কৃত্রিম নয়। কৃত্তিবাসবাবুরই নিজের হাতের খসড়া। সে কথা আমি জানতাম। আমিই ওটি বার করে এনে তাঁর জামায় এঁটে দিই—তিনি দেহরক্ষা করার পর। পিলটুর মুখ চেয়েই একাজ করেছিলাম, অন্যায় করিনি বোধহয়।

যাইহোক, ওই খসড়া আমার খুড়শ্বশুরের স্বহস্ত লিখিত বলে এ্যাটর্নিরা স্বীকার করেছেন। তাছাড়া ঐ খসড়ার আরেক কপি রেজিস্ট্রিকৃত হয়ে তাঁদের দপ্তরে ছিল তাও জানা গেছে।

পিলটু কৃত্তিবাস প্রদত্ত নিজের যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ টাকাটা তার বসোরার ঠিকানায় পাঠাবার ভার এ্যাটর্নিদের দিয়ে যাচ্ছেন। আশা করা যায় এই কাজের জন্য অ্যাটর্নিরা নিজের প্রাপ্য নিজেরা নিলেও তাঁদের কাছ থেকে ষোল আনার এক আনা ভাগও ভাগ্যে থাকলে কোন-না-কোন সময়ে আমরা পাব। জীবদ্দশাতেই পেতে পারি হয়ত' আর তাই আমাদের যথেষ্ট।

মামাদের দুজনের ধারণা, আপনার মতন গোয়েন্দা আর হয় না। পিলটু তো বলেছেঃ আপনি না থাকলে সে আজ কোথায় দাঁড়াত।

ইতি—
আপনার স্নেহধন্যা
অলকা দত্ত
ওরফে শ্রীমতী অলকা সেন